চায়ের ধোঁয়া

উৎপল দত্ত

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা-১২

উৎসর্গ

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক-নাট্যকার
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয় সমীপেষু-

ভূমিকার পরিবর্তে

যে ভাবে লেখার ইচ্ছে ছিল সেভাবে লিখতে পারিনি। অভিনেতারা বিচিত্র জীব, আবেগের ব্যবসায়ী। আবেগবশে অনেক কটূকথা বলেছি, অতিশয়োক্তিও করেছি। আবার এও ঠিক নাট্যযুদ্ধে যারা কাটাসৈনিক তাদের পক্ষে আবেগহীন হওয়াই বা কি করে সম্ভব? সাহিত্যসম্রাট তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এ গ্রন্থের 'আলমগীর' বিষয়ক প্রবন্ধটা অমৃত-পত্রিকায় পড়ে আমাকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। সেই জোরেই আজ প্রবন্ধগুলো ছাপতে সাহসী হলাম। দুর্বিনয় ক্ষমা করবেন।

উৎপল দত্ত

সূচীপত্র

খুন-জখম ... ১

শেক্স্পিয়ার ও ইবসেন ... ১০

জনপ্রিয়তা ও আলমগীর ... ২২

হ্যামলেট ও জনপ্রিয়তা ... ৫০

আঙ্গিক ... ৬১

দৃশ্যসজ্জা ... ৭৩

আলো ... ৮৪

সংগীত ... ৯৪

বাস্তব ও বাস্তবোত্তর ... ১২১

পরিশিষ্ট : থিয়েটারের ভাষা ... ১৩২

খুন-জখম

আড্ডার এলোমেলো কথায় কানের পোকা বেরিয়ে যায়। কি আর করা যাবে, শুনতে হয় বাধ্য হয়ে।

নাট্যকার চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন—হ্যাঁ, খুনোখুনি রক্তপাত আমার ভালো লাগে। ছেলেবেলা থেকে ভালো লেগে এসেছে। শুনতে খারাপ শোনাচ্ছে? সত্যি কথা অনেক সময়ে অমনি শোনায়। ন বছর বয়সে যখের ধন, পনেরো বছরে অদৃশ্য মানুষ, কুড়িতে উইলকি কলিন্‌স, তিরিশে মিকি স্পিলেন। গোটা কয়েক মৃতদেহ না থাকলে বই পড়তে আমার তেমন ভালো লাগে না।

দার্শনিক হাসলেন—ওটা যৌবনের চোঁয়া ঢেকুর। চেপে বসে থাকো সেরে যাবে। নাট্যকার মুখিয়ে উঠলেন—আজ্ঞে না, আমি যা বললাম ভেবে দেখবেন। পৃথিবীর অধিকাংশ নাটকের মূল কথাটা আমি বলেছি। নাটকীয় সংঘাত বলতেই বোঝায় দৈহিক সংঘাত। ধপাধপ কয়েকটা দেহ পড়ে যায় মঞ্চে। চিরকাল পড়ে এসেছে। নাট্যরস মানেই একটু উত্তেজনা, একটু খুনখারাপির ঝোঁক। এই বলে নাট্যকার চুরুটে আগুন দিতে লাগলেন।

সেই সুযোগে ভাষাবিদ বললেন—ওটা যা বলছ সে একটা সাময়িক বিকার। গত মহাযুদ্ধের ফলে যে আশাগুলো ডাস্টবিনে পচেছে তার দুর্গন্ধ। র‍্যাবোঁ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—আসছে খুনীদের জমানা—ভোয়াসি ল্য তঁ দেস আসাস্যাঁ। তারপর দ্রুত দেঁতো ফরাসীতে বললেন:

ও! তু লে ভিস্, কলের, লুক্সুর—
মায়নিফীক্, লা লুক্সুর
সুরতু মসোঁজ এ পারেস্।

আমরা কিছু বুঝলাম না। না বোঝার জন্যেই তো বললেন, তাই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে দেখে ভাষাবিদ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

নাট্যকার আগ্রহাতিশয্যে চুরুটটা ধরার আগেই কথা বলে ফেলতে দেশলাইটা নিভে গেল।

সেই সুযোগে দার্শনিক বললেন—কাব্যগুণে ভূষিত না হলে কোনো জিনিষই সাহিত্যপদবাচ্য নয়। মহাভারতে—নাকি রামায়ণে—বশিষ্ঠ মুনি—নাকি বিশ্বামিত্র বায়ু উদ্গার করলেন; সেটাকেও সুষমায় মণ্ডিত করে কাব্যের অন্তর্গত করা হয়েছে। মিকি স্পিলেন যদি আদর্শ হয় তবে কিন্তু আপনার নাটক নিছক দেহজ কামনায় প্রকাশ হয়ে থাকবে। তাঁর ছ'টি বইয়ে আটচল্লিশটা খুন সংঘটিত হয়েছে।

নাট্যকার চুরুটটা ফেলেই দিলেন। বললেন—স্পিলেন আদর্শ এ কথা কখন বললাম? স্পিলেন, পড়তে ভালো লাগে বলেছি। আর কাব্যগুণ অবশ্যই। স্পিলেনের ছ'টা বইয়ে আটচল্লিশটা খুন। শেক্‌স্‌পিয়ারের ছ'টা ট্র্যাজেডিতে একান্নটা। কাব্যগুণে শেক্‌স্‌পিয়ার আমাদের মুকুটমণি। নোংরা বলে স্পিলেন অ-সাহিত্যিক বা কু-সাহিত্যিক। স্পিলেন আমেরিকার অবধূত।

দার্শনিক বললেন—তাহলে বিবাদটা কোথায়?

ভাষাবিদ বলে উঠলেন—খুন-জখম মানুষের মনের পাশবিক দিকের প্রকাশ। তাকে এক-একটা সময়ে হয়তো সাহিত্যে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু মানবসাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ—অন্য দিকটার প্রকাশ। সুস্থ আবেগ, সুস্থ সবল মন, সাধারণ মানুষ।

নাট্যকার বললেন—আমরা নাটকের কথা বলছি। টুনা মাছ ধরতে গিয়ে হেমিংওয়ে-র বুড়ো জেলের যে সুস্থ সবল সংগ্রাম তা নাট্যগুণ-ভূষিত নয়। তা গল্প বা উপন্যাস বা কাব্য। নাটকে খুন-জখম চিরকাল থেকেছে, থাকবে। শেক্‌স্‌পিয়ার থেকে ব্রেশ্‌ট্‌ পর্যন্ত। সুস্থ সবল অ্যাভারেজ মানুষকে ঘিরে আজ পর্যন্ত কেউ সার্থক নাটক সৃষ্টি করতে পারেন নি। নায়ক মানেই জীবনের ব্যতিক্রম। বা মানুষের অসুস্থ দিকের প্রকাশ। কোনো-না-কোনো দিক থেকে এটা সত্য।

ভাষাবিদ বললেন—জঁ। ক্রিস্তফ?

নাট্যকার ধমকে উঠলেন—আঃ, এ তো মহাজ্বালায় পড়লাম ! নাটকের কথা বলছি, উপন্যাস টানছেন কেন ?

ভাষাবিদ বললেন—কেন ? উপন্যাসেও নাটকীয় উপাদান থাকতে পারে, উপন্যাসও নাটকীয় হতে পারে।

নাট্যকার বললেন—এক্স্যাক্ট্‌লি। 'জাঁ ক্রিস্তফ' অ-নাটকীয় উপন্যাস। 'ওয়র এণ্ড পীস'-ও। অথচ 'রেসারেকশন' নাটকীয়। 'টু হ্যাভ এণ্ড হ্যাভ নট' নাটকীয়। কেন এদের নাটকীয় বলছেন ভাবুন তো ?

ভাষাবিদ একটু ভেবে বললেন—এদের ঘটনার গতিটা প্রখর।

নাট্যকার বললেন—তার চেয়ে বলুন এদের মূল ঘটনাটা খুন-জখম-নারীহরণ জাতীয়।

ভাষাবিদ ভাবিত হলেন। বুঝলাম নাট্যকার জিতছেন।

নাট্যকার তোড়ে বলে চলেছেন—হ্যামলেট পাগল, ওথেলো খুনী, ম্যাকবেথ ম্যাস্ মার্ডারার, এণ্টনি ব্যাটা মদ্যপ এবং একটা অতীব নির্লজ্জ ধরনের মেয়েমানুষের জন্য নিজের দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করল। লিয়ার নিজের মেয়েকে মারল। হুগো যে অতবড় কবি—

ভাষাবিদ বললেন—উচ্চারণটা উগো।

নাট্যকার বললেন—আরে রাখুন ভাষার কচকচি। হুগো পর্যন্ত নাটকের বেলায় পুলিশের ডায়েরির মতন লেখেন। গ্যেটেও তাই।

ভাষাবিদ 'গ্যেটে' উচ্চারণটা ঠিক করে দিতে গিয়ে থেমে গেলেন।

নাট্যকার আরো একগাদা উদাহরণ দিয়ে চললেন—টলস্টয় অমন সাত্বিক লোক, নাটকের বেলায় খুনোখুনি ছাড়া কথা নেই। আরো আগে যান—সফোক্লিস, ইউরিপিডিস—কি দেখছেন ? রাজবিদ্রোহ, মাকে বিবাহ, নিজের চোখ উৎপাটন, আত্মহত্যা, বিদ্রোহীকে গুহায় পাথর চাপা দিয়ে হত্যা। কাব্যগুণ অবশ্যই। কিন্তু মূল ঘটনাগুলো লক্ষ্য করুন।

দার্শনিক এই সময়ে তর্কে প্রবেশ করে বললেন—কিন্তু ইবসেন, শ', চেকভ ? এঁদের নাটকীয়তা কোথায় ? ক'টা খুন-জখম এঁদের নাটকে ? আধুনিক নাটকে আপনার থিওরি প্রযোজ্য কি ? আধুনিক নাট্যকার

স্বাভাবিকত্বের চৌহদ্দি ছাড়াতে চাইছেন না, তাই বলে কি তাঁরা নাট্যকার নন।

নাট্যকার হেসে উঠলেন। বললেন—ইবসেন, স্বাভাবিকত্বের চৌহদ্দি ছাড়াতেন না কে বলেছে আপনাকে? ইবসেন নিয়ে না-হয় আরেক দিন বসা যাবে। শুধু ঐ শ আর চেকভ—ঐ দু জন একটা বিশেষ যুগকে প্রতিফলিত করেছিলেন। তখন পূর্বেকার রোম্যান্টিসিজম্ ভেঙে একটা নূতন লজ্জা-লজ্জা ভাব পয়দা হয়েছিল। যাকে বলে ভিক্টোরিয়ান প্রুডারি। ছুঁৎমার্গ। অশ্লীল জিনিষ বাদ দাও, রক্তারক্তি বাদ দাও, সূক্ষ্ম ভদ্রতায় আচ্ছন্ন করো চিত্তকে। কটু কথা বললে মনে লাগে, এই-গরু-সরো-না ধরনের মনন। তার জন্যেই এঁদের নাটক অন্য পথে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু ওটা সাময়িক মুহ্যমানতা, অচিরেই সে-সব উড়িয়ে আধুনিক নাট্যকাররা চিরন্তন নাট্যাদর্শকে ফিরিয়ে এনেছেন।

দার্শনিক হতবাক হলেন। এই সময়ে চা এসে পড়েছিল, তাতে চুমুক দিলেন সশব্দে; তাতে আবার ভাষাবিদ ঐ ভিক্টোরিয়ান ধরনেই একটু চমকে উঠলেন। দার্শনিক বললেন—আপনি বলেন কি? আধুনিক নাটকে খুন-জখম! সোমারসেট্ মম্—

নাট্যকার বত্রিশ পাটি বার করে হাসলেন, বললেন—নাম করলে মম্-এর। যিনি জাত ঔপন্যাসিক, গল্পবাজ। তাঁর নাটক ঐ গল্পের পর্যায়েই রয়ে গেছে, নাট্যপদবাচ্য হয় নি। এবার দেখুন সত্যি যাঁরা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তাঁদের নাটকে কিভাবে এসেছে খুন-জখম। প্রিস্টলি দেখুন। দেখুন মার্কিন নাট্যকারদের—টেনেসি উইলিয়ম্‌সকে অবশ্য আপনারা স্পিলেন-এর জাতভাই বলবেন; কিন্তু লিলিয়ান হেলম্যান পড়েছেন? পড়েছেন আর্থার মিলার? পড়েছেন শেরউড এণ্ডারসন? ট্রিক্ এস্টেলা-নামক খুনী গুণ্ডার জীবনেতিহাস পড়েছেন এণ্ডারসনের নাটক? হেলম্যানের 'লিটল্ ফক্‌সেস্' পড়েছেন? আনুপূর্বিক খুনের কাহিনীটা লক্ষ্য করেছেন? কিস্‌লি পড়েছেন? দেখেছেন 'ডেড্ এণ্ড' নাটকে খুন-জখমের আধিপত্য আর অশ্লীল ভাষার তীব্রতা?

দার্শনিক বললেন—আমেরিকানদের কথা বাদ দাও। হিংস্র রঙীন কমিক পড়ে পড়ে তারা মানুষ হয়।

নাট্যকার বিজয়গর্বে হাসেন। তারপর বলেন তবে জার্মানিতে যাই চলো। চিন্তার রাজা জার্মানি। টলার পড়েছ? ভিনকেলমান নপুংসক হয়ে গেছে, তার মর্মবেদনা টলারের উপজীব্য। 'ব্রাইড গডেস্' এ খুনটা লক্ষ্য করেছ? 'ম্যাসেস এণ্ড ম্যান' এর গোলাগুলিটা লক্ষ্য করেছ? ব্রেশ্‌ট্‌কে ধরো। গ্যালিলিওর বিচার আর উৎপীড়ন, লুকুলস এর মৃত্যুদণ্ড, স্পেনীশ বিপ্লবী কারার এবং হত্যা, মঙ্গোলবর্গাবা মাদার কারেজ—এসবই তার সাবজেক্ট। আর ব্রেশ্‌ট্‌ এর পুরোনো নাটকগুলোর তো আর-কোনো বাছবিচার নেই উইলেট বলছেন ক্রাইম, ড্রিংক্‌, রেপ, মার্ডার, প্রস্‌টিটিউশন, নর ভায়োলেনস নাথিং ইজ স্পেয়ার্ড। আধুনিক নাট্যকারদের আদর্শ, নাট্যগুরু বের্টল্ট ব্রেশ্‌ট্‌ তার এই কীর্তি। ফ্রান্সে যান জিরাছুর 'শাইয়োর পাগলিনী' পড়েছেন? পাগল আর খুন। সার্ত্র পড়েছেন? লা ক্রীম পাসিওনেল। কামোন্মত্ত হত্যা।

ভাষাবিদ বললেন এটা মশাই যুদ্ধজনিত বা চিন্তার জগৎ। ঐযে একটা চক্র গড়ে উঠেছিল ইওরোপে খেলাধূলা যাদের নেশা, জাজ্‌-সংগীত যাদের রক্তসংগীত, উগ্র ধর্মভাব বা ধর্মবিদ্বেষ যাদের মজ্জাগত—সেইযে লোরকা, কক্‌তো, মায়াকভ্‌স্কি গোষ্ঠী—এসব তাদের উদ্ভট চিন্তারই রূপান্তর। নাট্যকার বললেন সেই লোরকা কক্‌তো গোষ্ঠী আবার হুগো ছুমা চক্রের উত্তরসূরী। হুগোরা আবার শেক্‌সপিয়ার মার্লোর শিষ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। এটাই চিরন্তন মহৎ নাটকের বিষয়—খুন। যুদ্ধের ব্যর্থতা ব্যথতা সব বাজে কথা। নাটকের ইতিহাসই খুন-জখমের খতিয়ান।

একটু নীরবতা থম থম করছিল। হঠাৎ দার্শনিক বললেন—কালিদাসে খুন জখম নেই।

নাট্যকার তৎক্ষণাৎ বললেন—বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, কালিদাস পড়তে ভালো লাগে?

দার্শনিক বলেন— নিশ্চয়ই। অমন কাব্য।

উল্লাসে নাট্যকার চেঁচিয়ে উঠলেন—এক্‌স্যাকটলি ! কাব্য ! ওগুলো নাটক নয় ! অনুষ্টুভ ত্রিষ্টুভের বন্ধনে বেপরোয়া নাটক খোলে না। কালিদাসে নাট্যরস ক্ষীণ, ফিকে হয়ে গেছে। কারণ ? কারণ খুন-জখমের ওপর ভরতবাবুর জাতক্রোধ।

দার্শনিক বললেন— শোপেনহাউয়ের বলেন সব সাহিত্যের উদ্দেশ্য হল মানবজাতির বংশবৃদ্ধির আশঙ্কাকে রূপ দেয়া। খুন, হত্যা প্রভৃতিতে কি বংশবৃদ্ধি হয়, না বংশ লোপ পায়।

ভাষাবিদ বললেন—বংশবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে বলেছেন ; বংশবৃদ্ধি দেখাতে হবে এমন কথা বলেন নি ! প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করলে তো সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাচ্ছে, না কি ? ওথেলোর উদাহরণ দিয়েছেন শোপেনহাউয়েব– ওথেলো ডেসডেমোনাকে হত্যা করে বংশবৃদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ করল, তাই আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করল। দর্শকরাও তৃপ্ত হয়ে বাড়ি গেল।

নাট্যকার শোপেনহাউয়ের পড়েন নি। তাই ধূমপান করতে লাগলেন।

একটু পরে দার্শনিক বললেন—রবীন্দ্রনাথ ? রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভা মানেন তো ?

রবীন্দ্রনাথের নামোচ্চারণেই ঘাবড়েছিলেন নাট্যকার, ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

ভাষাবিদ বললেন—আর মেটেরলিংক ? তারপর এলিয়ট ?

নাট্যকার শেষোক্ত নামটায় লাফিয়ে উঠেছিলেন ; কিন্তু ভাষাবিদ নিজেই শুধরে নিলেন—না, এলিয়টের নাটকে খুন-জখম-নারীসম্ভোগের অভাব নেই।

দার্শনিক বললেন—কই জবাব দিচ্ছেন না যে ? রবীন্দ্রনাথ আর মেটেরলিংককে আপনার থিওরিতে ফেলতে পারবেন ? নাট্যকার চটে জবাব দিলেন—দু জনেই মূলত কবি। পৃথিবীর এত নাট্যকার থাকতে

কবিগুরুকে নিয়ে পড়েছেন কেন? কোনো থিয়োরিতেই তাঁকে ধরা যায় না। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাবলে থিওরি ভুল প্রমাণ হল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যই বা কোন থিওরিতে পড়ে? তাবলে কাব্যের থিওরি নেই?

এবার একটু নীরবতা নামল। একটু পরে নাট্যকার বলতে লাগলেন—আমি নাটুকে লোক, নাটকই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। অন্য বইতেও আমি নাটকীয়কে খুঁজি। অ-নাটকীয় আর নাটকীয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝার শ্রেষ্ঠ উপায় হল গল্প-উপন্যাস-কবিতা-ছবি-গানে নাটকীয়কে খোঁজা। ভূতের গল্প ধরুন।

ভাষাবিদ হেসে উঠেছিলেন, নাট্যকার তাঁকে খ্যাপাটে চোখে দগ্ধ করে বলে উঠলেন—ভূতের গল্প যে আর্ট এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। ভূতের মধ্যে নাটকীয় হল থিওডোর ড্রাইজার-এর ভূতেরা। অ-নাটকীয়, কাব্যপ্রধান হল ওয়াল্টার ডি-লা-মেয়ার-এর ভূত। অসম্ভব নাটকীয় গুণে ভূষিত থাকে এম. আর. জেম্‌স্‌-এর প্রাচীন ভূতেরা, অথবা এলজারনন ব্ল্যাক্‌উডের ভূতেরা। ততোধিক কবি কবি ভূত হল এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-এররা। বলা বাহুল্য ড্রাইজার, জেম্‌স্‌ এবং ব্ল্যাকউডকে আমার ভালো লাগে। ডি-লা মেয়ার এবং ওয়েল্‌স্‌-এর ভূতদের আমার পছন্দ নয়। জিনিষটা পরিষ্কার হল?

দার্শনিক বললেন—কতকটা। এডগার এলান পো সম্বন্ধে কি মত?

নাট্যকার বললেন—পো-এর রোমাঞ্চকর গল্পরা কখনো নাটকীয়, কখনো আবার একদম চিন্তাপ্রধান। 'কালো বেড়াল', 'গোল্ড বাগ', 'পিট্‌ এণ্ড পেণ্ডুলাম্‌'—এসব নাটকীয়। 'লাইজীয়া' বা 'ওভাল পোর্ট্রেট' কাব্যপ্রধান। পো-এর গল্প 'আমন্‌তিলাদো' বোধহয় জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম। বুঝতে পারছেন কি বলছি?

ভাষাবিদ বললেন—হ্যাঁ, এবার পরিষ্কার হয়েছে।

দার্শনিক বললেন—তাই বুঝি বাংলা নাটকে আজকাল খুন-জখমের আধিপত্য বাড়ছে।

নাট্যকার বললেন —আধিপত্য চিরকালই ছিল। আমাদের ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকে মুহুমুহুঃ খুন-জখম। আগের সামাজিক নাটকেও তাই। মাঝে একটু তথাকথিত স্বাভাবিকত্ব অনুপ্রবেশ করেছিল; স্বাভাবিকত্ব আমি তাকে বলি না। বলি সামান্যতা, ক্ষুদ্রতা। পুতু পুতু করে বেঁচে থাকা কেরানীর জীবন। পটলের দর আর ছেলের আমাশা। ঘরে চাল নেই আর অফিসের বড়বাবুর নেকনজর। এখন আবার এসব থেকে নাটক মুক্ত হতে চাইছে। ঘটনাকে চাইছে, দৈনন্দিনকে নয়। তরুণ রায় চেষ্টা করেছিলেন রংমহলে। জোছন দোষ দাস্তিদার করেছিলেন 'তুই মহলে'।

ভাষাবিদ বললেন-- কেন, তার আগে 'উল্কা'?

নাট্যকার সরোষে বললেন আমরা সিরিয়াস নাটক নিয়ে আলোচনা করছি। বাংলার মিকি স্পিলেনদের বমন নিয়ে নয়।

দার্শনিক বললেন তাহলে তো সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে নাটক লিখতে হয়!

নাট্যকার ছাড়বার পাত্র নন; বলেন-- কেন, সাধারণ মানুষ কি খুন করে না, আত্মহত্যা করে না? অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের শকুন্তলা রায় কি খুব অসাধারণ এক মেয়ে? 'অংগার' নাটকে যারা মরল তারা কি সব রাজা-বাদশা? ফেরারী ফৌজ-এও তো মরল কত; আমাদের ঘরের ছেলেই তো সব আসলে সাধারণ মানুষ বলতেই আপনারা ভাবেন ক্লীব, নির্জীব মানুষ। না, তাদের নিয়ে নাটক সৃষ্টি করা যায় না। সাধারণ মানুষ মানে, যে শ্রেণী-সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছে। জীবন-মৃত্যু যার পায়ের ভৃত্য। পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে রীতিতে নাটক সৃষ্টি হয়ে এসেছে তাকে বজায় রেখেই নূতনকে গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ মানুষ নাটকে আসবে নয়া-ট্র্যাজেডির নায়ক হয়ে।

দার্শনিক গাঁইগুঁই করেন— কিন্তু আজকের দিনে আর বাবার ভূত এসে বলে যায় কি করে যে কাকা অন্যায়ভাবে সিংহাসন দখল করেছে, তাকে কোতল করো? খুনোখুনি কমে গেছে।

নাট্যকার হাসলেন—আপনারা আবার শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলেন !!! আজকের খুন আরো ব্যাপক, আরো মারাত্মক। পুলিসের গুলি, মালিকের গুণ্ডার ছুরি, পেটোয়া ইউনিয়নের গুপ্তহত্যা, কারখানায় দুর্ঘটনা। ক্লান্ত শ্রমিকের ক্লান্তির মাশুল, দুর্ঘটনা। আর কত চান ? এসবই হবে নূতন নাটকের বিষয়বস্তু। আগের নাটকে যেটা ছিল ব্যক্তি বিশেষের খুন হওয়া, এখন সেটা হয়ে দাঁড়াবে শ্রেণী-সংগ্রামের ব্যাপক খুন। আজকের সমাজের ধুতি-পাঞ্জাবিতে ভুলবেন না মশাই, তলায় রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। ধুতি-পাঞ্জাবিতে ভুলে নাটককে নোলক আর ঘোমটা পরিয়ে খাটো করে ক্ষুদ্র করে বাবুর অঙ্কশায়িনী করে দিয়ে আসবেন না। সমাজ একটা যুদ্ধক্ষেত্র। নয়া যোদ্ধৃবৃন্দকে তুলে ধরুন ; আপসে সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে উঠবে।

ভাষাবিদ বললেন—অনেক কথা হয়েছে, এখন এস দাবা খেলা যাক। বটভিনিক টালকে চতুর্দশ খেলায় যেভাবে মাৎ করেছিলেন, দেখেছ ?

শেক্‌স্‌পিয়ার ও ইবসেন

সে দিন আড্ডায় এসেছিলেন কালীকান্তবাবু। এবং এসেই যা করলেন তাকে ইংরেজরা নাম দিয়েছে হাত থেকে ইট ছাড়া। বললেন— শেক্‌স্‌পিয়ার-এর নাটক অবজেক্‌টিভ্‌, ইবসেন-এর নাটক সাবজেক্‌টিভ্‌।

বোমার মতন ফেটে পড়ল ঘরখানা নাট্যকার এবং দার্শনিক হাসতে হাসতে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন। ভাষাবিদ খ্যা-খ্যা-রকমের একটা বিশ্রী শব্দ করে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন।

কালীকান্ত চটে উঠলেন, বললেন— এত হাসবার কি আছে? ছাপার অক্ষরে পড়েছি কথাটা।

তাতে নাট্যকার বললেন—যাঃ সত্যি, কেন ধাপ্পা দিচ্ছেন? অমন কেউ লিখতে পারে?

দার্শনিক বললেন—নাটক কি হোসিয়ারী দোকানের গেঞ্জি নাকি? নানা রকম 'গণেশ, সরস্বতী, সামারকুল' জাতীয় লেবেল মারতে হবে?

ভাষাবিদ বললেন--তাছাড়া ঐ কথাগুলোর অর্থ কি? লেখক গাঁজা-টাটা খান নাকি?

কালীকান্ত পকেট থেকে একখানা বাংলা সাপ্তাহিক উদ্ধার করে পড়ে শোনালেন। হ্যাঁ, সত্যি। এক সমালোচক লিখেছেন শেক্‌স্‌পিয়ার অবজেক্‌টিভ্‌, গিরিশ ঘোষও; এঁদের নাটকে নাকি ঘটনা আগে ঘটে, তারই ফলে পরে চরিত্রের প্রকাশ বা বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। আর ইবসেন নাকি প্রবর্তন করেছিলেন এক নূতন ধরা, সাবজেক্‌টিভ্‌। এখানে নাকি চরিত্র ঘটনার দাসত্ব করে না; বরং উল্টে চরিত্রই ঘটনার সৃষ্টি করে।

কালীকান্ত থামলেন না, বলে চললেন— উদাহরণও দিয়েছেন সমালোচক। আধুনিক জীবনে বিরোধ-সংঘর্ষ এত বেশি যে ইবসেনধর্মী নাট্যকারেরা দোকানে সামান্য জুতো-কেনাকে কেন্দ্র করেই বিরাট ভাবাবেগ

সৃষ্টি করতে সক্ষম। এইযে লিখেছে ঃ মনে করি একটি মেয়ে একজোড়া জুতো কিনবে—

নাট্যকার বললেন—ঠাহর করে দেখুন তো দাদা একটা ইটালিয়ান নাম কোথাও স্বীকার-টীকার করা হয়েছে কিনা ?

কালীকান্ত খেপে গিয়ে বললেন—অর্থাৎ ?

নাট্যকার বললেন—না, বলছিলাম ঐ জুতো-কেনা কাহিনীটা সেজারে ৎসাভাতিনি নামক জগদ্বিখ্যাত ইটালিয়ান চিত্রনাট্যকারের কল্পনা। ওটা আধুনিক ইটালিযান চলচ্চিত্রে নয়া-বাস্তববাদ, নেও-রিয়ালিজম-এর উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন ৎসাভাতিনি। তাকে আধুনিক নাটক, তথা ইবসেনীয় নাট্যকল্পের উপমা হিসেবে ব্যবহার করে সমালোচক নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

দার্শনিক বললেন—অজ্ঞতা নয়, এর মধ্যে সুপরিকল্পিত কোনো অপচেষ্টা আছে। কালীকান্ত যা পড়লেন তার ছত্রে ছত্রে এত ভুল যে আমার মনে হয় লেখক ইচ্ছে করে সত্য গোপন করতে প্রয়াস পাচ্ছেন।

ভাষাবিদ হেসে উঠে বললেন— না হে, এসব লেখককে তুমি চেনো না। সত্যি তাঁরা জানেন না। অথচ জানেন যে, এটা জানাতে চান না।

আরেক বার তিন জনে ছাদ-ফাটানো হাসি হেসে দাবা খেলতে বসলেন। অর্থাৎ ভাষাবিদ ও দার্শনিক বসলেন, নাট্যকার দাঁড়িয়ে চুরুট ধরিয়ে অযাচিত মাতব্বরি করতে উদ্যত হলেন।

কালীকান্ত অপমান বোধ করলেন ; কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারলেন না, কারণ একটু পরে চা-স্যাণ্ডুইচ্ আসবে। তাই ঝগড়ায় মাতবেন স্থির করে চেঁচিয়ে বললেন—কোথায় ভুল ? এ লেখার কোথায় ভুল দেখান দিকি ?

কেউ গা করে না দেখে, কালীকান্ত হেঁকে উঠলেন—বিদ্যার অহংকার করা ভাল নয় !

নাট্যকার বললেন—অবিদ্যার অহংকারের চেয়ে শতগুণ ভালো। দিচ্ছি আপনার প্রশ্নের জবাব, আগে চা আসুক।

আমরা ছুটোছুটি করে চা-টা নিয়ে এলাম। খেতে খেতে দার্শনিক দাবা ছেড়ে দিয়ে বললেন—প্রথমত, ঐ সাবজেক্‌টিভ্‌-অবজেক্‌টিভ্‌—ওসব কাতুকুতু-দেয়া কথা আর ব্যবহার করবেন না, কথা দিন—তারপর বলব।

নাট্যকার বললেন—হ্যাঁ, দাদা, আগে কথার মোহ কাটান। কথার লোভে বুদ্ধি বিসর্জন কোনো কাজের কথা নয়। শেক্‌স্‌পিয়ার-এর চরিত্র ডগ্‌বেরি (অবজেক্‌টিভ্‌ না সাবজেক্‌টিভ্‌ জানি না) কথার ঝকমারি করে কি বিপদে পড়ত জানেন? কথার ঝংকার মানায় সুকুমার রায়কে বা লুইস ক্যারল-এর জ্যাবার ওয়াকিকে।

ভাষাবিদ তৎক্ষণাৎ বললেন—অথবা র‍্যাবোঁকে। যিনি প্রতিটি স্বরবর্ণের মধ্যে রং দেখতে পান। মনে আছে সেই বিরক্তিকর কচকচি—'আ নোয়া, এ ব্লাঁ, ই রুজ, উ ভের্‌, ও ব্ল্যো ঃ ভইয়েল্‌!'

ফরসী-টরাসী শুনলেই নাট্যকার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান; তাই হলেন। ধোঁয়া ছেড়ে ভাব দেখালেন ও কবিতাটা তাঁর পেটেই ছিল, মুখে আসে নি দুর্ভাগ্যক্রমে।

সেই সুযোগে দার্শনিক বললেন—মূল কথাটা দেখা যাক। শেক্‌স্‌পিয়ার বা গিরিশ ঘোষ-এর নাটকে নাকি ঘটনা প্রধান, ঘটনা আগে ঘটে। সেই ঘটনাচক্রে খাবি খেতে খেতে চরিত্র বিকশিত বা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ একটু উল্টে বললে দাঁড়ায়—চরিত্র ঘটনাকে প্রভাবান্বিত করে না, ঘটনাই চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করে। লেখক সব গুলিয়েছেন! চরম গোলা গুলিয়েছেন। গ্রীক্‌ নাটকের আদর্শকে শেক্‌স্‌পিয়ার-এর ঘাড়ে চাপিয়েছেন। কে যে উদো কে যে বুদো বুঝতে পারেন নি।

নাট্যকার বললেন—উড়ো উড়ো কথা শুনেছেন, ডেউস এক্‌স্‌ মাকিনার কথা। ভাগ্যচক্রে মানুষের লাঞ্ছিত হওয়ার কথা। সেটাই চাপিয়েছেন শেক্‌স্‌পিয়ার-এর দুর্বল স্কন্ধে। অমোঘ ঘটনাচক্রে অসহায় মানুষ—এ ইস্কাইলাস সফোক্লিস-এর যুগের কথা। 'এন্টিগোনে প্রোমিথিয়ুস'-এর যুগের কথা। শেক্‌স্‌পিয়ার-এর নাটক ঘটনার দাস—এ তথ্য বাইরে বলবেন না, লোকে ইট মারবে!

কালীকান্তের মুখ স্যাণ্ডুইচে ভরা। তবু দ্রুত তাকে অচর্বিত অবস্থায়ই গলাধঃকরণ করে, হঠাৎ বিষম খেয়ে বললেন—কেন? শেক্‌স্‌পিয়ার-এর নাটকে ঘটনা নেই?

নাট্যকার গর্জন করে বললেন—আরে ত্তোর মশাই, কথাটা বুঝতে চেষ্টা করেন না কেন? ঘটনা তো থাকবেই; ঘটনা ছাড়া নাটক হয় নাকি? চমকপ্রদ ঘটনা, মুহুর্মুহুঃ ঘটনা। প্রশ্নটা ঘটনা থাকে কি থাকে-না নয়। নায়ক ঘটনার দাস, না ঘটনা নায়কের দাস—এটাই আলোচনা হচ্ছিল। শেক্‌স্‌পিয়ার-এর নাটক কি প্রাচীন গ্রীক নায়কের মতন নিয়তির বিধানে ঘটনাস্রোতে ভেসে যায়? না, নিজের চরিত্রের দৌর্বল্যজনিত মহাপ্রমাদ সংঘটিত করে ঘটনা সৃষ্টি করে, ঘটনার মোড় ফেরায়, ঘটনাকে ট্র্যাজেডির পথে টেনে নেয়—আমার ধারণা, যে-কোনো কলেজের ছাত্রছাত্রী এ ব্যাপারটা জানেন, বোঝেন। ঐ সাপ্তাহিকের সমালোচক তাঁদের কাউকে পাকড়ে তত্ত্বটা বুঝে নিলেই তো পারেন।

কালীকান্ত দেখলাম আমার মতনই একগুঁয়ে; বলে উঠলেন—বুঝলাম না। শেক্‌স্‌পিয়ার-এর নায়করা ঘটনা সৃষ্টি করেন কি? ম্যাকবেথ তো ডাকিনীদের হাতে ক্রীড়নক।

আবার হাসির হুল্লোড় উঠল। হাসতে হাসতে চোখের জল মুছে দার্শনিক বললেন—দাদা, এগারো বছরের কোর্স চালু হয়ে গেছে ইস্কুলে; ইংরিজিকে প্রথম পেপার নিলে শেক্‌স্‌পিয়ার পড়তে হয়; আপনি বরং কোনো ইস্কুলের ছাত্রকে জিগ্যেস করে নেবেন।

নাট্যকার কিন্তু হাসতে হাসতে খেপে গেলেন। বললেন—এত বই লেখা হয়েছে, আপনারা কি তার কিছুই পড়েন না? আর পড়েন না যদি, তবে ছাপার অক্ষরে শেক্‌স্‌পিয়ার সম্বন্ধে লিখতে সাহস পান কি করে? চেম্বার্স বা রবার্টসন্‌-এর বই না-হয় আপনাদের বোধগম্য নয়; কিন্তু ব্র্যাড্‌লিটাও কি পড়ে রাখতে পারেন নি।

কালীকান্তের তখন বোধহয় গোঁ চেপেছে; বললেন—ডাকিনীরা ম্যাকবেথকে প্ররোচিত করে নি?

এবার ভাষাবিদও খেপে উঠলেন, বললেন—না নিজের অন্তরে রাজা হওয়ার সুপ্ত বাসনা না থাকলে ম্যাকবেথ প্ররোচিত হতেন না। ডাকিনীর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ম্যাকবেথ চমকে উঠলেন কেন? রাজাকে হত্যা করতে তো ডাকিনীরা বলে নি, হত্যা করলেন কেন? ব্যাংকোকে হত্যা করতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল তাঁকে? ত্বর মশাই, শেক্‌স্‌পিয়ার অমন বালখিল্য চরিত্র আঁকেন না।

এই সময় বোমা পড়ল ঘরে, নাট্যকার বললেন—এ দিকে রবার্টসন্ সাহেব প্রায় প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে ডাকিনীর দৃশ্যগুলো শেক্‌স্‌পিয়ার-এর লেখাই নয়।

কালীকান্ত ঘর্মাক্ত; বললেন—সে কি!

—হ্যাঁ খুব সম্ভব মিড্‌ল্‌টন নামে এক নিকৃষ্ট নাট্যকারকে ডাকা হয়েছিল শেক্‌স্‌পিয়ার-এর নাটকটা সংশোধন করতে। তিনি—

কালীকান্ত বললেন—কি ধৃষ্টতা!

—এই মিড্‌ল্‌টন সাহেবের একটা পুরোনো নাটক ছিল, তার নাম 'উইচ' বা ডাকিনী। সে নাটকের বিস্ময়কর সাফল্য দেখে গ্লোব থিয়েটারের মালিকরা ঐ ডাকিনী-জাতীয় কিছু 'ম্যাকবেথে' জুড়ে দিতে ঐ জনপ্রিয় অথচ নিরেট নাট্যকারকে আহ্বান করেন, তিনি তখন নির্মমভাবে শেক্‌স্‌পিয়ার-এর ওপর কলম চালিয়ে ডাকিনী দৃশ্য-গুলো জোড়েন। বড় বড় দৃশ্য—যার ফলে 'ম্যাকবেথ' এখন খণ্ডিত; অতিমাত্রায় সংক্ষিপ্ত।

কালীকান্তের বিস্ময়ে বিহ্বল অবস্থা। বললেন—এরকম প্রক্ষিপ্ত অংশের ফলে নাটকের সূত্র ছিঁড়ে গেল না কেন? যা ইচ্ছে জোর করে জুড়লে নাটকের ঘটনাপরম্পরা, ঘটনাসংহতি, চরিত্রবিকাশ, এসব বাধা পেল না?

—কে বললে পায় নি? কিছু পড়াশুনা থাকলে জানতে পারতেন ম্যাকবেথ নাটকে প্রচুর সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, যার কিনারা করতে পণ্ডিতরা হিমসিম খাচ্ছেন। ডাকিনী-দৃশ্যের পর ম্যাকবেথ-এর ওপর

তাদের প্রভাব একরত্তিও না থাকার সমস্যা, হেকেট্‌সমস্যা, লেডি-ম্যাকবেথের পুত্র থাকার সমস্যা, ম্যাকডাফ-ম্যালকম দৃশ্যের সমস্যা, তৃতীয় হত্যাকারীর সমস্যা, দ্বাররক্ষক দৃশ্যের সমস্যা, বাদ-দেয়া অংশের সমস্যা। পুরো নাটকটি তালগোল পাকিয়ে গেছে। একটু ঠাহর করে নাটকটা পড়ুন, জানতে পারবেন।

কালীকান্ত একটু চুপ করে ভাবলেন, আরো একখানা স্যাণ্ডুইচ খেলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন—তাহলে বলছেন শেক্‌স্‌পিয়র-এর নায়করা ঘটনার দাস নয়?

এতক্ষণে ধরেছেন দেখছি, বলেন দার্শনিক। ম্যাকবেথই যখন দাস নয়, তবে আর কে দাস? ম্যাকবেথ-এরই কিছু সম্ভাবনা ছিল ঘটনাচক্রে পড়ার। কারণ ডাকিনীরা তাকে নাকি উসকেছে। সে ম্যাকবেথই দেখলাম নিজের উচ্চাশা ছাড়া কারুরই দাস নয়; উচ্চাশা আর কল্পনাপ্রবণ মনের দাস! অন্য নায়করা তো স্বহস্তে নিজের গলা কেটেছেন। নিজেদের দোষের জালে নিজেরা জড়িয়ে ল্যাজে-গোবরে হয়েছেন—হ্যামলেট-এর চিন্তাশীলতা আর কর্মবিমুখতা, ওথেলোর অতিরিক্ত ভালবাসা, এণ্টনির বিকৃত উগ্র প্রেম, রাজা লিয়ার-এর বিশ্বাসপ্রবণতা আর বাৎসল্য, করিওলেনাস-এর দম্ভ, ব্রুটাস-এর রাজনৈতিক আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাত। প্রত্যেকে এঁরা নিজেদের চরিত্র-প্রভাবে ঘটনা সৃষ্টি করেছেন; ঘটনার আবর্তে এঁদের চরিত্র হয়তো আরো দুর্ব্বলতায় ফেটে পড়েছে; কিন্তু ঘটনার মূলে হল চরিত্র, চরিত্রের মূলে ঘটনা নয়।

এই সময়ে ভাষাবিদ টিপ্পনি কাটলেন—যাঁরা নাটকগুলোয় উপর উপর চোখ বোলান বা চার্লস ল্যাম্ব-এর সংক্ষিপ্তসার পড়েন, তাঁরা হয়তো শুধু ঘটনাই দেখেন। সামান্যতম নাট্যরসিকও কিন্তু ঘটনার মূলে মানবচরিত্রে অনায়াসে প্রবেশ করেন।

নাট্যকার মুহূর্ত শুনছিলেন, সুযোগ পেতেই বললেন—আর যেমন ভদ্রলোকের শেকসপিয়ার-বোধ, তেমনি তাঁর গিরিশ-বোধ। তাঁর মতন

সমালোচকের পক্ষে যোগেশের ট্র্যাজেডি-র মূলে ব্যাঙ্ক-ফেল হওয়া ছাড়া আর কি চোখে পড়বে? ব্যাঙ্ক-ফেল হওয়াটাকেই বা এত তুচ্ছ করছেন কেন? ওটা তো সে সময়ের সামাজিক ব্যবস্থার পতনের প্রতীকও হতে পারে। যাক কথা হচ্ছে, ব্যাঙ্ক ফেল না পড়লেই রমেশ কি দাদাকে ছেড়ে দিত? ব্যাঙ্ক ফেল পড়েও তো যোগেশ পথে বসে নি, সেই ব্যাঙ্ক তো আবার টাকা দিতে শুরু করল। সে টাকার ফল যোগেশ পেলেন না, কারণ রমেশ বাধা দিল। রমেশের চরিত্রটা বুঝতে চেষ্টা করেছেন কি লেখক? 'প্রফুল্ল' নাটকের ঘটনাচক্রের মূলে রমেশ-চরিত্রের কুলিশকঠিন গৃধ্নুতা এবং যোগেশের সিনিসিজম্। এই সিনিসিজম্ই তো পুরো ট্র্যাজেডির জন্যে দায়ী। যে জানছে, বুঝতে পারছে যে মা রত্নগর্ভা, এক ছেলে মাতাল, এক ছেলে চোর, এক ছেলে উকিল; যে উপলব্ধি করছে তাকে দিয়ে সর্বনাশা দলিল সই করানো হচ্ছে—সব জেনেও সে কিছুই করছে না; তার কেমন যেন বিতৃষ্ণা এসেছে। লেখক এসব কিছুই বোঝেন নি। যাক, কলেজের ছাত্রের কাছে দু-চার দিন ক্লাস করুন, সব খোলসা হবে।

কালীকান্ত উঠতে চেষ্টা করলেন; ঘাড়ে মৃদু রদ্দা মেরে তাকে বসিয়ে দিয়ে নাট্যকার বলে চললেন—লোমহর্ষক ঘটনাপ্রবাহ প্রায় সব নাট্যকারই এঁকে থাকেন; কিন্তু ঘটনা যদি আকস্মিক হয়, বা দৈব ইচ্ছায় ঘটে, তবে মহৎ ট্র্যাজেডি সৃষ্টি অসম্ভব। ট্র্যাজেডির মূল কথাই হল মানবচরিত্রের জটিলতা; ঘটনাটা উপলক্ষ মাত্র। মানুষের ইচ্ছায়, মানুষে মানুষে সংঘর্ষে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয়।

দার্শনিক বললেন—একমাত্র গ্রীক নাটক ছাড়া। সেখানে দৈব ইচ্ছার প্রাধান্য সত্ত্বেও ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয়েছে। তার নানা সমাজিক কারণ আছে; দৈব ইচ্ছা যে এলিউসিয়ান এবং অরফিক্ তন্ত্রে দীক্ষিত মানুষের কাছে কতটা বাস্তব, কতটা সত্য ছিল, তা এই ইলেকট্রিক ফ্যান্-এর তলায় বসে আমরা সম্যক বুঝতে পারব না। ওদের কাছে দৈব প্রায় দৈনন্দিন ঘটনার মতনই প্রত্যক্ষ

নাট্যকার গলা তুলে বললেন—তারপর থেকে কোনো মহৎ নাটকে নায়ক ঘটনার দাসত্ব করে নি। গিরিশের নাম করেছেন লেখক! কিন্তু পড়েন নি বলে আমার ধারণা। ক্ষীরোদপ্রসাদ পড়েছেন উনি? পুরো ভীষ্ম নাটকে হয়তো ভীষ্ম-চরিত্র বাদ দিয়ে কেবল কুরুক্ষেত্রের মারামারি-টাই তার চোখে পড়বে! 'নর-নারায়ণ' সম্বন্ধে লিখতে গেলে আমি হল্‌প করে বলতে পারি কর্ণ-চরিত্র খারিজ করে উনি আবার সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে মনোনিবেশ করবেন!!!

দার্শনিকও এবার উত্তেজিত হয়েছেন; বললেন—ব্যাঙ্ক ফেল না হলে 'প্রফুল্ল' ঘটত না!! কি কথা! তবে পাশা না খেললে মহাভারত ঘটত না! অতএব মহাভারত ঘটনাসমষ্টি মাত্র, চরিত্ররা গৌণ!

নাট্যকার ফোড়ন কাটলেন—অতএব ব্যাসদেব অবজেক্‌টিভ্‌ অথর!

একপশলা হাসি হল আবার!

কালীকান্ত বললেন—এবার তাহলে উঠি!

কেউ কর্ণপাত করেন না; কিন্তু আর-একরাউণ্ড চা এসে পড়াতে কালীকান্তর যাওয়া হল না।

এ দিকে নট্যকার বলছেন—আসলে কি জানেন। প্রত্যেকে নিজের ক্ষুদ্রতার চৌহদ্দিতে দেখে শেক্‌স্‌পিয়ারকে, গিরিশকে। এলিয়টই তো লিখেছেন—স্ট্রেচির চোখে শেক্‌স্‌পিয়ার এক অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার; মারির চোখে শেক্‌স্‌পিয়ার এক নূতন যৌগিক ধর্মের পুরোহিত: উইণ্ডহাম লুইস-এর চোখে তিনি বিপ্লবী। আমাদের এই বাঙালী ছা-পোষা সমালোচকের চোখে শেক্‌স্‌পিয়ার অবশ্যই ছা-পোষা যাত্রাওয়ালা। মুহুর্মুহুঃ ঘটনা ছাড়া আর-কিছু তাঁর চোখে পড়ার কথা নয়।

দার্শনিক জুড়ে দিলেন—ঠিক তেমনি মধ্যবিত্তসুলভ তাঁর ইবসেন-আলোচনা। শেক্‌স্‌পিয়ারেই যিনি হোঁচট খান্‌ তিনি ইবসেনকে আর বোঝেন কি করে? দেখি কাগজটা? ইবসেনকে কি কি বিশেষণে উনি ভূষিত করেছেন সেটা স্বচক্ষে দর্শন করি!

সাপ্তাহিকটা একরকম কেড়ে নিয়ে দার্শনিক লেখাটার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে বলেন—এই যে! সাবজেক্‌টিভ্‌ ট্রিটমেণ্ট! ভাবতান্ত্রিক রীতি! এঁর নাটকে ঘটনার ভিড় নেই, নাটকীয় চরিত্র ঘটনার দাসত্ব করে না। তারপর ৎসাভাতিনি থেকে উদ্ধৃত-করা (বিনা স্বীকৃতিতে) জুতোর গল্প। ভাববস্তুপ্রধান! ইবসেন-প্রবর্তিত সাবজেকটিভ্‌ ট্রিটমেণ্ট!

ভাষাবিদ শূন্য কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন—আমার ধারণা উনি মডার্ণ লাইব্রেরি-প্রকাশিত এগারোটি ইবসেন নাটকের বাইরে কিছু পড়েন নি। সেই এগারোটারই আবার সবকটা পড়েছেন কিনা সন্দেহ। নইলে ইবসেন-এর নাটকে ঘটনার ভিড় নেই—এ হেন একখানা উক্তি করলেন কোন আক্কেলে? আর ঐ সাবজেক্‌টিভ্‌ যে কি বস্তু কিছুতেই তো বুঝতে পারছি না!

কালীকান্ত এবার প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন—না, না, উনি বলতে চান ইবসেন-এর নাটকে ঘটনা কম, অপেক্ষাকৃত কম। চরিত্রদের আবেগ এবং ভাবই ওঁর নাটকের সম্পদ।

ভাষাবিদ ধমকে ওঠেন—অর্থাৎ ইবসেন কেরানী। ইবসেন দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে নাটককে আবদ্ধ রাখেন। জুতো-কেনার মতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারকে অবলম্বন করেই তাঁর চরিত্ররা প্রকাশিত হয়! নিজের মধ্য-বিত্ততায় ইবসেনকে ধরতে চাইছেন ভদ্রলোক।

কালীকান্ত বললেন—কেন? ইবসেনও কি চমকপ্রদ ঘটনায় না ভাসাতেন? 'ডল্‌স্‌ হাউস' তো—

নাট্যকার চেঁচিয়ে উঠলেন—তাই তো বলছি আমরা। 'ডল্‌স্‌ হাউস' আর 'গোস্টস্‌' ছাড়া ইবসেন-এর কোনো নাটকই প্রায় পড়া হয় না। মডার্ণ লাইব্রেরি-র সংকলনের বাইরে আমরা যাই না। তাই উইলিয়ম আর্চার-এর আড়ষ্ট ভিক্‌টোরিয়ান ইংরিজিতে অনূদিত কয়েকটা সামাজিক নাটক থেকে ইবসেনকে বুঝতে চেষ্টা করি। বিসমিল্লায় গলদ!

দার্শনিক এবার বলে উঠলেন—'লেডি ইংগের অফ অস্ট্রাট' পড়েছেন? ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লেখা। চিরাচরিত যে ঘটনাবহুল ষড়যন্ত্র-খুন-খারাপির

নাট্যরীতি তাই অনুসরণ করে লেখা। শেষ দৃশ্যটা জানেন? দু জন সামন্তরাজকে নিমন্ত্রণ করে লেডি ইংগের মদের পাত্র হাতে তুলে দিলেন। দু জনে মদ খেয়ে ফেলতেই মহিলা বলে উঠলেন, একটায় বিষ আছে। দু জনই মৃত্যুভয়ে ছট্‌ফট্ করছেন! এ তো খাঁটি শেক্‌স্‌পিয়ার ধারা—ফরাসী নাট্যকার স্ক্রীব-এর মারফত এসে পৌঁছেছে ইবসেন-এর কলমে।

ভাষাবিদ বললেন—ইবসেন-এর আর-একটি নাটক 'ভাইকিংস্ এট্ হেল্‌গেলাণ্ড্'। সামুদ্রিক ঝড়ের মতনই এর বিপুল প্রচণ্ড ঘটনার তোড়। পড়েছেন?

কালীকান্ত বললেন—নামও শুনি নি।

ভাষাবিদ বললেন—কাহিনীটা শুনতে ইচ্ছা করেন? ভাইকিং বীরগুনার-এর পুত্র এগিল নিখোঁজ। গুনার ভাবলেন প্রতিদ্বন্দ্বী বীর ওরন্থলফ্ এগিলকে হত্যা করেছেন। তাই গুনার খুন করলেন ওরন্থল্‌ফ্-পুত্র থোরাল্‌ফ্-কে। এমন সময় এলেন ওরন্থল্‌ফ্, সঙ্গে এগিল; এগিলকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে ওরন্থলফ্-এর ছ জন পুত্র প্রাণ দিয়েছে। এখন এসে শুনতে হল বংশের শেষ বাতিটিও নিভে গেছে ভুল বোঝাবুঝির ফলে! কোথায় জুতো-কেনার ক্ষুদ্রতা, বলুন দেখি কালীকান্তবাবু! এ নাটকের আর-একটা জিনিস লক্ষণীয়। এখানে ঘটনা প্রায় চরিত্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বসেছে। চরিত্র ঘটনার দাসত্ব প্রায় স্বীকার করে বসেছে। কারণ ঐ ভুল-বোঝাবুঝিটা প্রায় গায়ের জোরে ঘটানো হয়েছে। থোরোল্‌ফ্‌কে যখন সদলবলে গুনার হত্যা করতে এলেন থোরোল্‌ফ্ জানত তার পিতা নির্দোষ; তিনি এগিলকে রক্ষা করতে গেছেন, খুন করতে নয়। তবু সে কথাটি কইল না; মুখ বুজে মৃত্যু বরণ করল। এ ধরনের ভুল-বোঝাবুঝি ইবসেন ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টি করেছেন ঘটনার চমৎকারিত্বের স্বার্থে। দেখছেন কালীকান্তবাবু—ঘটনাপ্রাধান্য শেক্‌স্‌পিয়ার-এর নাটকে নেই, আছে ইবসেন-এই (ক্ষেত্রবিশেষে)। অথচ ইবসেনকে বেমক্কা 'সাবজেক্‌টিভ্' আখ্যা দিয়ে বসেছেন আপনার সমালোচক।

এবার নাট্যকার যুদ্ধে প্রবেশ করলেন—ইবসেন-এর 'প্রিটেণ্ডাস' পড়েছেন ? হাঁ-মুখ দেখেই বুঝেছি পড়েন নি। ঐতিহাসিক নাটকের কাঠামোয় হাকন এবং স্কুলে নামক দুই রাজত্বলোলুপ সামন্তের দ্বন্দ্ব।

দার্শনিক ঘৃতাহুতি দিলেন--অন্তত এম্পেরর এণ্ড গ্যালিলিয়ান'-খানা পড়েছেন তো ? তাও না ? বেশ আছেন মশাই। সম্রাট জুলিয়ান খৃষ্টধর্মকে উৎখাত করে বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর—আগাথন-এর বল্লমের খোঁচায় প্রাণ হারিয়ে—তিনি খৃষ্টের কাছে হার মানলেন। শ্রীমতী ব্র্যাড্‌ব্রুক এই নাটককে 'ম্যাকবেথ'-এর সঙ্গে তুলনা করে সমগোত্রীয় প্রমাণ করে ছেড়েছেন। শুধু সমগোত্রীয় নয়, সমরীতিতে পরিকল্পিত। শেক্‌স্‌পিয়ার আর ইবসেন-এ খুব বেশি অমিল তো চোখে পড়ছে না ! মিলের দিকটাই তো বেশি।

ভাষাবিদ বললেন—পুরাপুরি মিল। শেক্‌স্‌পিয়ার উনিশ শতকে জন্মালে ইবসেন হতেন এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ইবসেন-এর নাট্যরীতি শেক্‌স্‌পিয়ারেরই উত্তরসূরী। এতক্ষণ ট্র্যাজেডি আলোচনা করেছি, এবার কমেডি দেখুন।

কালীকান্ত আকাশ থেকে পড়েন--ইবসেন কমেডি লিখেছেন ?

ভাষাবিদ বললেন--কেন 'লাভ্‌স্ কমেডি'র নাম শোনেন নি ? 'এজ ইউ লাইক ইট্' পড়েছি বলে মনে হয়। ফাল্‌ক্ আর সোয়ান্‌হিল্‌ডে—রোজালিণ্ড এবং ওরলাণ্ডোর প্রতিচ্ছবি। তার ওপর সেই হাস্যরসের ঝরণা সেই আনন্দ মাঝে মাঝে অপেরার মতন গান, নাচ, ছন্দ।

নাট্যকার বললেন—আর শেষ বয়সের রচনা অমর কাব্যসুষমাময় নাটকগুলি 'হোয়েন উই ডেড এওয়েকেন', 'মাস্টার-বিল্ডার', 'ব্রান্ট্', 'পিয়ার গিন্ট্'—ওসবের মধ্যে দৈনন্দিন ঘটনা আর জুতো-কেনা খুঁজতে যাওয়া যে নেহাত আহাম্মুকি তা কি বলে দিতে হবে ? জীবনের অর্থ খোঁজবার কাব্যময় প্রয়াস ঐগুলো, দার্শনিক তত্ত্বে ঠাসা। ঘটনাও। সব মানুষই এ জগতে আসে একটা নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করতে; ইবসেন তাকে বলেন 'ভোকেশন' বা 'কল্'। সেই 'ভোকেশন' খুঁজে

মরছে শেষ নাটকগুলোর নায়করা। এগুলোর একটাকেও অভিনয়োপ-যোগী বলে স্বীকার করা হয় না। ওগুলো নাটকই নয়, ওগুলো কাব্য এবং দর্শন।

ভাষাবিদ এবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—হায়রে কপাল! 'ডলস হাউস', 'গোস্টস্', আর 'এনিমি অফ্ দি পিপ্‌ল' পড়েই ইবসেনকে মধ্যবিত্ত জীবনের প্রবক্তা বলে ভেবে বসে আছেন সমালোচক!

দার্শনিক বললেন—এর জন্যে দায়ী বার্নার্ড শ, আর্চার প্রমুখ ইবসেন-বাদীরা। নিজেদের সুবিধেমত এঁরা ইবসেনকে বিকৃত করে পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করেছেন। দৈনন্দিন সমস্যামূলক নাটকের রচয়িতাকে তাঁদের ভালো লাগে, তাঁদের দরকার। তাই ইবসেন-এর সারা জীবনের সৃষ্টিকে চেপে দিয়ে দুটি কি তিনটি নাটক নিয়ে জয়ঢাক পিটিয়েছেন। পর্বতকে লুকিয়ে মুষিককে নিয়ে প্রদর্শনী খুলেছেন!

ভাষাবিদ বললেন—আরে রাখো না হে! বর্নার্ড শ-এর গ্রন্থখানাই কি পড়েছেন সমালোচক? তাহলে অন্তত সাবজেক্‌টিভ্-অবজেক্‌টিভ্ প্রভৃতি অনুস্বার-চন্দ্রবিন্দুর হাট বসাতেন না। যুক্তি একটা খাড়া করতেন। তাহলে দেখছেন কালীকান্তবাবু ইবসেন ভাবতন্ত্র-ফন্ত্র কিছুই প্রবর্তন করেন নি। এককথায় শেক্‌স্‌পিয়ার আর ইবসেন একই জাতের নাট্যকার!

কালীকান্ত বললেন—বাড়ি যাই, বড়ির ঝোল খেয়ে শুতে হবে।

জনপ্রিয়তা ও আলমগীর

নাট্যপরিচালক যে দিন আসরে এলেন আমরা চমকে উঠেছিলাম। জবু-থবু হাবাগোবা ফোকলা মানুষ; অথচ ইনি নাকি কলকাতায় একটি আস্ত পেশাদার থিয়েটার চালাচ্ছেন। আগে থাকতে জানান দিয়েই এসেছিলেন তাই চা-খাবার সে দিন গোড়া থেকেই তৈরি ছিল। ভাষাবিদ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বিয়াঁ ভেনু! কমেঁ। ভু পর্তে ভু?

পরিচালক ফরসী ব্যাপারে দেখলাম আমাদেরই মতন বিজ্ঞ। তিনি বললেন—নো মসিয়ে, ইংলিশ ইজ্ দি ওনলি পার্লে ত্যাট আই ভু।

ভাষাবিদ ও দার্শনিক দু জনেই দেখলাম কথাটায় একটা সূক্ষ্ম রসের পরিচয় পেয়ে পুলকিত হলেন। বুঝলাম আজকের আড্ডাটা জমবে।

খানিক খেয়ে (পরিচালক দেখলাম বুভুক্ষু, খেতেও পারেন মন্দ নয়।) পরিচালক বললেন—আজ পর্যন্ত দাদা কলির কলিকাতাকে বুঝতে পারলাম না। এ দর্শক যে কি চায় জানি না। আর না জানলে থিয়েটার উঠে যাবে। শ-খানেক শো চলে যায় বুঝতে কোন পথে নাটকটাকে নেয়া উচিত।

নাট্যকার বললেন—অর্থাৎ? নাটক আবার কোন পথে নেবেন কি? নাটক তো আগে থাকতেই লেখা হয়ে আছে; আপনারা তো তার অভিনয় করছেন শুধু।

পরিচালক ক্রমান্বয়ে তিন মিনিট ধরে কেক খেলেন (কেষ্ট এনেছিল ভালো কেক সাহেব পাড়া থেকে); তারপর বললেন—আগে থাকতে যা লেখা হয়ে আছে আর আমরা যেটা অভিনয় করছি দুটোর মধ্যে ক্রমশই একটা পার্থক্য গজিয়ে উঠতে থাকে। নাট্যকারের নাটক অনেক সময়েই যথাযথ রাখা সম্ভব হয় না।

নাট্যকারের হাত থেকে কাপটা ঠং করে পড়ে গেল—তার মানে? আপনি তার ওপর কলম চালান?

পরিচালক বললেন—নিশ্চয়ই। সেইজন্যেই আমি পরিচালক।

দার্শনিক বললেন—মিডলটন যেমন চালিয়েছিলেন ম্যাকবেথ-এর ওপর।

সবাই একটু চাপা হাসি হাসলেন। পরিচালক জবাবে আরো একটু কেক খেয়ে বললেন—না, ম্যাকবেথের মতন নাটক পেলে কলম চালাবার দরকার হত না বোধহয়। উপমাটা ঠিক হল কি? আমি হয়তো মিডলটন; শেক্স্‌পিয়ারকে তো কই দেখতে পাচ্ছি না কলকাতায়!

নাট্যকার একটু অবজ্ঞার হাসি হাসলেন; মুখে একটা নীরব উক্তি প্রকট হল—নিশ্চয়ই এই স্থুলোদর নাট্যবিশারদ আমার সাতখানা প্রকাশিত নাটকের একটিও পড়ে নি; নইলে শেক্স্‌পিয়ার নেই বলে? মনে মনে এই বলতে বলতে তিনি পোড়া চুরুটের আধখানা ধরাতে শুরু করলেন।

দার্শনিক বললেন—তা কলমটা যে চালান, কি নীতির ভিত্তিতে?

পরিচালক তৎক্ষণাৎ বললেন—কেন, বক্স-অফিস! জনপ্রিয়তা!

ক্রোধে দার্শনিক ও নাট্যকারের মুখ কালো হয়ে ওঠে। তাই ভাষাবিদই কথা কইবার ভার নিলেন—লোকে কি চায় তার জন্যে নাটক বদলান?

পরিচালক বললেন—নিশ্চয়ই! লোকে যদি নাটক দেখতেই না এল তবে অভিনয়টা করার সার্থকতা কি? নিভৃতে সাহিত্য বা চিত্রসাধনা হতে পারে, নিভৃত নাট্যসাধনা সোনার পাথুরে বাটির মতই উদ্ভট।

ভাষাবিদ বললেন—খাওয়াটা একটু কমিয়ে আমার কথাটা শুনুন দিকি! জনপ্রিয়তার আলেয়ার পেছনে কতদূর পর্যন্ত গিয়ে থাকেন সাধারণত?

পরিচালক খাওয়া থামালেন না; কিন্তু বললেন—যা যা দরকার সবই করি। নায়ক বাঁচবে, না মরবে। শেষে মিলন হবে, না বিচ্ছেদ। আগুনের খেলা দেখাব, না বৃষ্টির। কেউ ভালো করছে, তার পার্টটা বাড়ানো হক। কেউ খারাপ করছে; তার যতটা না থাকলেই নয় ততটা থাক।

একটা বিকট হাস্যরোল উঠল ঘরের মধ্যে। হাসতে হাসতে নাট্য-

কার বললেন—তাহলে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ আপনার থিয়েটারে রুদ্ধ?

পরিচালক বললেন—সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যদি দর্শকের বোধগম্য না হয় তবে রুদ্ধ।

নাট্যকার জ্বলন্ত চুরুটখানা পরিচালকের নাকের চার ইঞ্চির মধ্যে সবেগে নেড়ে দিয়ে বললেন—দর্শককে ভগবানের বা কাজীর আসনে বসিয়ে শাশ্বত সৃষ্টি সম্ভব? ভিইয়োঁ, শেলী, কীটস, র‍্যাবো, ভেরলেন, অস্কার ওয়াইল্ড থেকে শুরু করে চলচ্চিত্রকার আইজেনস্টাইন বা ফ্ল্যাহার্টি বা ইংমার বের্গমান—এইসব মনীষীরা যদি জনপ্রিয়তার যূপকাষ্ঠে গলা বাড়াতেন, তবে আর সার্থক শিল্পসৃষ্টি করা হয়ে উঠত না।

ভাষাবিদ বললেন—এমনকি বিদ্রোহই এদের শিল্পপ্রেরণার মূল। জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করেছেন বলেই এরা শিল্পী।

পরিচালক বললেন—আপনি তো নিজেকে নাট্যকার বলেন! অথচ যাদের নাম করলেন তাঁদের একজন ছাড়া কেউ নাট্যকার নন। তার ওপর শেলীর দেশত্যাগের কারণ তাঁর সাহিত্য কি? না ব্যক্তিগত ব্যাপার! ফ্রাসোঁয়া ভিইয়োঁ কি জীবন যাপন করতেন জানেন নিশ্চয়ই; কবি হিসেবে তিনি মহান হতে পারেন, কিন্তু সামাজিক জীবনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। র‍্যাঁবো ও ভেরলেন বিকৃত যৌন জীবন যাপন করে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, কাব্যের জন্য নয়। অস্কার ওয়াইল্ড নাট্যকার হিসেবে রীতিমত সফল তথা জনপ্রিয় হয়েছিলেন এটা আপনার জানার কথা। চটকদার কথা আর হাস্যরস প্রচুর পরিমাণে ইনজেক্ট করে তাঁর সামাজিক নাটকগুলোকে হিট করিয়েছিলেন ভদ্রলোক; নাট্যকার হিসেবে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন; লাঞ্ছিত হয়েছিলেন যৌনবিকারের ফলে। একমাত্র কীটসকে ছেড়ে দিচ্ছি; বেচারা সত্যি গালি খেয়েছিলেন; কিন্তু তাও মুষ্টিমেয় গণ্ডমূর্খ স্ফীতমস্তিষ্ক কয়েকটা সমালোচকের হাতে। দেখুন দাদা, এই নামকটা অনেকেই করে থাকেন অ-জনপ্রিয়তার উদাহরণ হিসেবে। বিশেষ করে আজকাল র‍্যাঁবো-ভেরলেন নিয়ে পড়েছেন একা-

ধিক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ; এঁরা বোধহয় আমাদের বোকা বোঝান ; এঁরা ভাবেন ফরাসী এ দেশে কেউ জানে না।

এই বলে পরিচালক আবার বীরবিক্রমে আহার করতে থাকলেন। আমরা যারা ছোট আমাদের মনে হল নাট্যকার জীবনে কখনো এমন অপদস্থ হন নি; অন্তত আমাদের সামনে হন নি। মুখখানা হাঁড়িপানা করে তিনি একটু দম নিলেন ; তারপর যেই বলেছেন—কেন ওরা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন—অমনি পরিচালক আবার শুরু করলেন—

—আর, ঐ আইজেনস্টাইন ! ওঁর সব ছবি জনতা নাকচ করেছিল এ কথা সত্যি নয়। 'নেভস্কি' ও 'পোটেমকিন' যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল।

নাট্যকার ধমকে উঠলেন—আর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ইভান' শুধু নাকচ হয় নি ; এক রকম নিষিদ্ধ হয়ে গেল !

পরিচালক ছাড়েন না—শ্রেষ্ঠ কিনা বিবেচ্য ; অনেকে বলেন 'পোটেমকিন' শ্রেষ্ঠ।

নাট্যকার আরো জোরে ধমকে উঠলেন—কথা হচ্ছে আইজেনস্টাইন জীবনে কখনো জনপ্রিয় হবার জন্যে ছবি করেন নি। জনপ্রিয়তা তাঁর উদ্দেশ্য হয় নি কোনো দিন। কোনো ছবি যদি জনপ্রিয় হয়ে থাকে তাহলে আকস্মিকভাবেই হয়েছে।

পরিচালক খুব সরলকণ্ঠে বললেন—তাহলে ছবি করতে গেলেন কেন? ষোলো মিলিমিটারে শুধু নিজের জন্য মনের সুখে ছবি তুলে শোয়ার ঘরে বসে দেখলেই পারতেন।

নাট্যকার বললেন—একটা নতুন আর্ট সৃষ্টি করার জন্যে ছবি করেছেন আইজেনস্টাইন। ফ্রেম থেকে ফ্রেমে যাওয়ার নতুন একটা গতি ; একটা সঙ্ঘর্ষ, একটা শিল্প সৃষ্টি করার জন্যে করেছেন ছবি।

পরিচালক বললেন—অন্তত কিছু লোক যদি তা না বোঝে তবে কার জন্যে এটা সৃষ্টি করেছেন ?

নাট্যকার বললেন—নিজের জন্য।

দার্শনিক বললেন—নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে। সেটাই শিল্পের

উদ্দেশ্য। নিজেকে মেলে ধরা সব মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। সেটারই উন্নত রূপকে আমরা বলি শিল্পকর্ম। অবশ্যই সেটা আপনার উপর প্রযোজ্য নয়; আপনি এই রকবাজদের শহরে বক্স-অফিসের ওপর চোখ রেখে নাটক করেন।

পরিচালক বাদে সকলে হাসলেন। তিনি শুধু বললেন—মেলে ধরার মানেই হচ্ছে কারুর চোখে নিজেকে মেলে ধরা। কার চোখে? নিশ্চয়ই দর্শকের। পক্ষিবিশেষজ্ঞরা বলেন ময়ূর বা মোরগ যখন পেখম মেলে বা ডানা মেলে তখন তা মাদা পাখির মন ভোলাবার জন্যে। আইজেনস্টাইনের মেলে ধরাটা হয়তো অনেকের ভালো লাগছে না, বা বোধগম্য হচ্ছে না; কিন্তু অন্ততঃ অল্পসংখ্যক কিছু লোককে মনে রেখেই তিনি ছবি করেছেন। চ্যাপলিন বা পুডোভকিন যেখানে লক্ষ মানুষের জন্যে ছবি করেন আইজেনস্টাইন করেছেন কয়েক শত লোকের জন্যে। তফাতটা সংখ্যাগত, পরিমাণগত; গুণগত নয়। বের্গমান সম্বন্ধেও অনেক কথাই বলা যায় অনেক কটূক্তিও করা যায়; সেটা আরেক দিন হবেখ'ন। আজকে জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কথা বলা যাক। চলচ্চিত্রের মহারথী তিন জনের নাম করেছেন যাঁদের ঠিক জনপ্রিয়তা জোটে নি; অন্যপক্ষে কয়েক কুড়ি মহারথীর নাম করতে পারি যাঁরা শুধু দিগদর্শক নন জনপ্রিয়তার শীর্ষ-স্থান-অধিকারীও বটেন। যথা চ্যাপলিন, পুডোভকিন, ডবশেংকো, ডনস্কয়, ইউৎকেভিচ বণ্ডারচুক এফ পাবস্ট লাং, জাক তাতি, কিং ভিডর রেনো ক্লেয়ার অরি ক্লুজো, কার্নে, এসকইথ, লেসলি হাওয়ার্ড, থরল্ড ডিকিনসন ওয়াইডা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বিপুল জনপ্রিয় বাহিনীর সামনে আপনার উদাহরণ অকিঞ্চিৎকর। যাক, কথা হচ্ছিল কলকাতার থিয়েটার সম্বন্ধে। জনপ্রিয়তার মুখে তুড়ি মারা সকলের পক্ষে সম্ভব, এক নাট্যকার ছাড়া। কবি, চিত্রকর, ঔপন্যাসিক —সকলে বলতে পারেন ভবিষ্যৎ আমাকে বুঝবে, তাই বর্তমানকে কাঁচকলা! আধুনিক দুর্বোধ্য কবিদের মধ্যে কেউ কেউ যে মহাশক্তিধর এটা অনেকেই স্বীকার করেন। কানওয়াল কিসন বা রামকিংকর-এর

শিল্প বর্তমানে বিপুল জনতা কর্তৃক উপেক্ষিত হতে পারে ; ভবিষ্যতের জনতা এঁদের মাথায় তুলে নেবেই। 'স্থাবর'-স্রষ্টা বনফুলের বই অধিকাংশ টিম টিম করে এক সংস্করণ চলে ; কিন্তু সে দিন বেশি দূরে নেই যখন 'অদ্ভুত' অধ্যুষিত গোয়াল পরিষ্কার করে লোকে বনফুলের জয়স্তম্ভ তৈরি করবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একজন নাট্যকারের নাম করতে পারেন কি যিনি জীবিতাবস্থায় স্বীকৃতি পান নি কিন্তু মৃত্যুর বহু বৎসর পরে পেয়েছেন ?

নাট্যকার বললেন --পাবেন, শীঘ্রই পাবেন। রবীন্দ্রনাথ, পিকাসো।

পরিচালক ততোধিক শান্তস্বরে জবাব দিলেন--রবীন্দ্রনাথ জীবিত অবস্থায়ই জনপ্রিয় নাট্যকার হিসেবে জনতার প্রণাম কুড়িয়ে গেছেন। জোড়াসাঁকো বা শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত অভিনয়গুলি ছেড়ে দিলাম। পেশাদার মঞ্চে পর্যন্ত তাঁর নাটক সমাদৃত হয়েছে। আর পিকাসো-র নাটক লোকে বোঝে নি ; তাই পিকাসো কোনো জন্মে নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবেন না।

ভাষাবিদ বললেন--এর্নস্ট টলের জনপ্রিয় হয়েছিলেন কি ? অথচ নাট্যকার হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা অনস্বীকার্য।

পরিচালকের প্রয়োজন হল না, দার্শনিকই বাধা দিলেন---না, টলের জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন বইকি। পিসকাটর প্রমুখ এক্সপ্রেশনিস্ট পরিচালকরা যেমন ভেরফেলকে তেমনি টলেরকে জনপ্রিয় করে গেছেন।

নাট্যকার সোৎসাহে বললেন —আর চেকভকে করলেন স্টানিসলাভস্কি।

পরিচালক বললেন---দেখছেন ? সবচেয়ে জটিল নাটক-রচয়িতারাও জীবিত অবস্থাতেই হিট করে তবে গেছেন। সদ্যোমৃত ব্রেশ্‌ট্‌কে দেখুন না। আর শেক্‌স্‌পিয়ার-মলিয়েরের তো ছেড়ে দিলাম। তাঁরা বাড়িগাড়ি সাজিয়ে রাজার সঙ্গে করমর্দন করে তবে গেছেন। এ দেশেও তাই। নাট্যকার প্রত্যেকে জনপ্রিয় হয়েছেন ; মানে যাঁরা জনপ্রিয় হয়েছেন তাঁরাই নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন ঃ দীনবন্ধু, মাইকেল, গিরিশ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ, রবীন্দ্রনাথ, যোগেশ চৌধুরী। তারপর

আধুনিকরা। আর দেখুন সঞ্জয় ভট্টাচার্য কি সুন্দর দু-চারটে নাটক লিখেছেন, যা কাব্য হিসেবে আমার পড়তে খুব ভালো লাগে; কিন্তু তিনি জনপ্রিয় হতে পারেন নি। আর পারেন নি বলেই পারলেন না।

দার্শনিক বেশ ভেবে বললেন—এর কারণ নাটক আর নাটকাভিনয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নাটককে শুদ্ধ অভিনয় হিসাবে দেখা যেমন আহাম্মুকি; নাটককে শুধু সাহিত্য হিসেবে দেখা ঠিক তেমনি একদেশ-দাশতা। এ যেন একই দেহের মুণ্ড আর ধড়কে আলাদা করে বিচার করা। কিছু লোক আছে যারা হয় এটা নয় ওটা নিয়ে প্রচণ্ড তিড়িং-বিড়িং করে। তারাই বোধহয় 'ভোট-দিন' ধরনের চিৎকারে সমালোচকদের কর্ণ বধির করে বিপথে চালিত করে। আসলে নাটক একাধারে সাহিত্য ও অভিনয়লিপি। তাই বর্তমানকে অস্বীকার করা নাটকের পক্ষে অসম্ভব। প্রতি মুহূর্তে দর্শকের প্রত্যক্ষ বিচারে সে যাচাই হয়। অভিনয়ের সময়টাও নাটকের অংশ। সেই সময়টা যদি দর্শকবিচারে সময়-নষ্ট হিসেবে প্রমাণিতও হয় তবে নাটকের দফা গয়া, নাট্যকারেরও আশায় জলাঞ্জলি। শুদ্ধ সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার আশা নাট্যকার করতে পারেন না।

নাট্যকার খেপে চুরুটটা নামিয়ে রেখে বললেন—আবার শুধু অভিনয়ও নাট্যকারের সাধনা হতে পারে না। ইনি যা বলছেন তাতে তো মনে হচ্ছে নাট্যকারকে কোনো সাহিত্যিক মর্যাদা দিতেই এঁরা নারাজ। যথেচ্ছ কলম চালিয়ে সাহিত্যকে মঞ্চোপযোগী করাই এঁদের কাজ।

পরিচালক এবার আহার শেষ করলেন; শেষ গ্রাসটি চিবোতে চিবোতে বললেন—না সাত্যিকারের সাহিত্য হলে আর মঞ্চোপযোগী করার দরকার হয় না। নাটক যখন সাহিত্যপদবাচ্য হয় তখন তা মঞ্চোপযোগীও হয়। এটাই আমার অভিজ্ঞতা।

নাট্যকার ক্রুর হাস্য করে বললেন—তাহলে আপনাদের হাতে বাজে নাটকই বেশি আসে বুঝি?

পরিচালক অম্লানবদনে বলেন—হ্যাঁ। তবে এক-আধ জন অজ্ঞ পণ্ডিত বলে থাকেন, বাংলায় উপন্যাস, কবিতা যত ভালো, নাটক তত ভালো

বেরুচ্ছে না। উপন্যাস-কবিতা বনফুল, প্রেমেন্দ্র এইরকম দু-চার জন ছাড়া কোথায় ভালো বেরুচ্ছে আমার জানা নেই। নাটকও তার চেয়ে খারাপ কিছু বেরুচ্ছে না। এক ছোটগল্প ছাড়া বাংলায় প্রথম শ্রেণীর কিছুই বেরুচ্ছে না। সব তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে নাটকও তৃতীয় শ্রেণীর হচ্ছে।

ভাষাবিদ তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন—এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত।

নাট্যকার হঠাৎ গর্জন করে বলে উঠলেন— মঞ্চোপযোগী অর্থ কি? বর্তমান কলকাতার বর্তমান মঞ্চের উপযোগী?

পরিচালক বললেন—হ্যাঁ।

নাট্যকার শ্লেষ ঢেলে বললেন—তার মানে অত্যন্ত নীচু মানের দর্শকদের চাহিদা মেটাবার জন্যে আপনারা অকাতরে নাটক পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেন?

পরিচালক বললেন—হ্যাঁ।

নাট্যকার বলে চললেন দম-দেয়া ঘড়ির মতন—অর্থাৎ টিকিট বিক্রির দিকেই আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ। তার জন্যে যাকিছু সস্তা, যাকিছু প্রতিক্রিয়াশীল সব আমদানি করতে আপনি প্রস্তুত?

পরিচালক ঢেঁকুর তুলে বললেন—আজ্ঞে না; তা কেন? সস্তা বা প্রতিক্রিয়াশীল জিনিস আমদানি করব কেন? মঞ্চোপযোগী মানে যে সস্তা জিনিস এই অমূল্য সংবাদটি আপনাকে কে দিলে?

নাট্যকারের রোষদৃষ্টির সামনে পরিচালকের নির্লিপ্ত ভাব দেখে ভাষাবিদ ও দার্শনিক যুগপৎ হেসে উঠলেন। ফলে নাট্যকার অসহ্য ক্রোধে পদচারণ শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতেই বললেন—তবে মঞ্চোপ-যোগী মানে কি?

পরিচালক দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বললেন—অন্য থিয়েটারের কথা জানি না; সেখানে হয়তো দর্শকের দোহাই দিয়ে সস্তা জিনিস দেখানো হয়; বোম্বের চিত্র-প্রযোজকরা যেমন দেখান। কিন্তু আমার নিজের ওপর আস্থা আছে। নাটককে মঞ্চোপযোগী করতে

গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বিষয় এনে ফেলা আমার থিয়েটারে অসম্ভব। অথচ নাটকটাকে এমন বাঁধুনি, এমন গতি, এমন চমক দিতে হবে যেন দর্শকের ভালো লাগে; তারা যেন আমার থিয়েটারকে বয়কট না করে। বিষয়বস্তু ব্যাপারে কোনো রকম আপোস আমি করি না; নাট্যকারের প্রগতিশীল বক্তব্যকে পুরোপুরি বজায় রাখা আমার স্বভাব; কারণ আমি নিজে প্রগতিশীল মানুষ। কিন্তু সেই বিষয়বস্তু যেন এমন রূপ নিয়ে দর্শকের সামনে আসে, এমন আঙ্গিক নিয়ে মঞ্চে ওঠে যাতে দর্শক বুঝতে পারে ও খুশি হয়। অন্যথায়. কি হবে? এই হবে, যে প্রচণ্ড রকমের বলিষ্ঠ বক্তব্য নিয়েও নাটক এমন দুর্বোধ্য রূপরীতিতে আত্মপ্রকাশ করবে যে কেউ বুঝতেই পারল না। বক্তব্যটা মাঠে মারা গেল। ফর্ম-এর পরীক্ষা কখনো দর্শককে বাদ দিয়ে হতে পারে না। দর্শকের জ্ঞানবুদ্ধিতে বিস্মৃত হয়ে পরীক্ষা চালালে শুধু নিজের বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পাবে, দর্শককে সঙ্গে নিয়ে এগুবার পথ রুদ্ধ হয়েই থাকবে। আমি কেমন বুদ্ধিমান তা দেখাবার জন্যে তো আর থিয়েটার খুলি নি মশাই। খুলেছি দর্শককে উন্নততর নাট্যরূপের সন্ধান দিতে। সেটা ক্রমে ক্রমে হয়। প্রথমেই এক যুগান্তকারী পরীক্ষার অবতারণা করলে দর্শক আর আসবেই না; তখন শূন্য প্রেক্ষাগৃহে প্রাণায়ামে বসতে হবে। এতে নাট্যজগতের কি উপকার কি উন্নতিটা হবে কিছুতেই মাথায় ঢোকে না আমার।

একটু থেমে পরিচালক আবার বলতে লাগলেন—সর্বোপরি আপনারা যাদের রকবাজ বলে ঠাট্টা করলেন তাদের ওপরে আমার আস্থা আছে। আমি বিশ্বাস করি কলকাতার দর্শক ও কলকাতার অভিনেতা ধাপে ধাপে এগিয়ে দুর্জয়তম পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারে উপনীত হতে পারবেন কয়েক বৎসরের মধ্যে। তখন যে-কোনো নাটকের যে-কোনো আঙ্গিকের রসগ্রহণ করতে দর্শক সক্ষম হবেন; আমার কাজ কমবে।

নাট্যকার পায়চারি থামিয়ে বললেন—নিজের ওপর আস্থা তো খুব। আপনার কি ধারণা নাট্যকাররা আপনার চাইতে থিয়েটারকে ও দর্শককে কম বোঝেন?

পরিচালক আকাশ থেকে পড়লেন ; বললেন—নিশ্চয়ই। অধিকাংশ নাট্যকারই কম বোঝেন। অভিনয় এবং পরিচালনা আমার পেশা মশাই। ওঁদের চাইতে আমি বেশি বুঝব না? কি ধরনের নাটক আমার হাতে বেশি আসে জানেন? যেখানে নাট্যকার পরিশ্রমী, আন্তরিক এবং মোটামুটি প্রগতিবাদী ; কিন্তু আঙ্গিকের ব্যাপারে নূতন পরীক্ষা তো দূরের কথা, প্রচলিত রীতিনীতিও এঁদের অজানা। আজ শত বৎসর যাবৎ বাংলা নাট্যশালায় যে কায়দাগুলো ব্যবহার হয়ে হয়ে পাকাপোক্ত হয়েছে, সেগুলোও এঁরা জানেন না। ফলে দুর্বল রূপরীতির জন্যে এঁদের বক্তব্য-গুলো জোলো, ফিকে অথবা স্থূল, সোচ্চার হয়ে রয়েছে।

নাট্যকার আবার প্রাণপণ শ্লেষ মিশিয়ে বললেন—শত বৎসরের কায়দাগুলো কি? ছেঁড়া ঝোলানো সীন, বাঁশি বাজিয়ে পর্দা ফেলা ও তোলা, দেরিতে আরম্ভ করা এবং কয়েক জন দাম্ভিক আত্মকেন্দ্রিক অভিনেতার আস্ফালন।

পরিচালক এবার চা ঢেলে নিলেন এক কাপ ; বললেন—ওগুলো হল কায়দার অপব্যবহার ; তার জন্যে কায়দা দায়ী নয়। ঠিক যেমন বিজ্ঞান দায়ী নয় আণবিক বোমার জন্যে। কয়েক জন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির ওগুলো অপকৌশল। তাছাড়া কথা হচ্ছিল নাট্যরচনার কায়দা নিয়ে। হঠাৎ মঞ্চপ্রয়োগের কায়দায় গেলেন কেন? ও বিষয়ে না-হয় আরেক দিন কথা কওয়া যাবে।

নাট্যকার বললেন—নাট্য রচনার কাযদাই বা কী সৃষ্ট হয়েছে?

পরিচালক বললেন (চায়ে আয়েসী চুমুক দিয়ে)—ঐযে বলেছিলাম ভালো নাটক মাত্রেই একাধারে মঞ্চ-সচেতন এবং সাহিত্য। সেই মঞ্চ-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে ; মাইকেলের কৃষ্ণকুমারীতে ওর শুরু ; ক্ষীরোদ-প্রসাদে ওর পুষ্টি ; রবীন্দ্রনাথে ওর চরম বিকাশ। এখানে নাটক যেমনি অভিনেয়, তেমনি কাব্য-সুষমাময়। সেই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিলেই হবে।

নাট্যকার বোধহয় একটু নরম হলেন ; বললেন—দেখুন দাদা, আপনার এই কথাটা বিবেচনাসাপেক্ষ। সাহিত্য আর মঞ্চচেতনা দুটো

একই সঙ্গে ভালো নাটকে থাকে, এ কথাটা বিনা প্রমাণে মেনে নেয়া অসম্ভব।

পরিচালক বললেন—প্রমাণ দিচ্ছি সংক্ষেপে, কারণ আমার সময় অল্প; করে খেতে হয় যে! রিহার্সাল আছে একটা। একটি অত্যন্ত মঞ্চসফল নাটক নিয়ে আমরা দেখতে চেষ্টা করব কিভাবে কাব্যচ্ছন্দ তার মধ্যে খেলা করছে। আরো দেখবেন যেখানেই মঞ্চ-প্রয়োজনে নাটকের বিশেষ আবেগপূর্ণ দৃশ্য আসছে সেখানেই কাব্যও স্পন্দিত হয়ে উঠছে এক আশ্চর্য অধীরতায়। অর্থাৎ জনপ্রিয় নাট্যরচনার সমস্ত প্রচলিত রীতিনীতি মেনে গেছেন নাট্যকার; দর্শককে ভালো লাগাবার যত পেশাদারী বাণ আছে, সব ছুঁড়েছেন নাট্যকার। সেই জনপ্রিয়তার চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই কাব্যসৃষ্টি করেছেন; জনপ্রিয়তার কায়দাকানুন কাব্যকে সীমিত করে নি, কোনো ব্যাঘাত ঘটায় নি; বরং সাহায্য করেছে, পরিপূরণ করেছে। ভালো নাট্যকার মাত্রেই জনপ্রিয় নাট্যকার।

নাট্যকার বললেন—এক মিনিট। তার মানে কি জনপ্রিয় নাট্যকার মাত্রেই ভাল নাট্যকার?

পরিচালক বললেন—তা, নিশ্চয়ই না। ভালো নাট্যকার মাত্রেই জনপ্রিয়; কিন্তু জনপ্রিয় মাত্রেই ভালো নাও হতে পারে। সব মানুষই জীব; কিন্তু সব জীবই মানুষ নয়। যাক। যে নাটকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর'; ১৯২১ সালে প্রথম অভিনীত। আপনাদের প্রত্যেকেরই নিশ্চয়ই পড়া বা দেখা বা দুটোই।

সকলে ইতিবাচক মাথা নাড়লেন।

পরিচালক উঠে দাঁড়িয়ে যেন অদৃশ্য রিহারর্সালকে উদ্দেশ্য করেই বক্তৃতা শুরু করলেন—'আলমগীর' আছে এখানে?

ধুলো ঝেড়ে দার্শনিক বার করলেন একটা ছেঁড়া ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী।

পরিচালক বললেন—এ নাটকের মঞ্চসাফল্য সম্বন্ধে অধিক বলার প্রয়োজন নেই। চরিত্র-বিশ্লেষণ বা ঘটনাবিন্যাস—ও সব অধ্যাপকের

বিভাগ। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে দর্শক এ নাটকের ঘটনার গতিতে রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকতে বাধ্য। ভীমসিংহ-জয়সিংহ সম্পর্ক ; আওরংজেব-উদিপুরী ; কামবক্‌স্‌-রূপকুমারী ; সর্বোপরি মোগল-রাজপুত সংঘর্ষের পটভূমিকা। সমান্তরালভাবে ছুটে চলেছে এতগুলি রসালো উত্তেজক কাহিনী। প্রত্যেকটিতে আছে আবার একটি ক'রে মধ্যচরিত্র, যে অটল, যে নিরপেক্ষ, যার স্থৈর্য দুই অস্থিরতার মাঝখানে এক প্রচণ্ড ব্যতিক্রমের মতন দাঁড়িয়ে আছে। ভীমসিংহ ও জয়সিংহেব মাঝখানে বৃদ্ধ রাণা রাজসিংহ; সম্রাট ও উদিপুরীর মাঝখানে দিলীর খাঁ; কামবক্‌স্‌ উপাখ্যানে বিক্রমসিংহ। এই মধ্যচরিত্র, অর্থাৎ ল্যাটিনে যাকে বলা হয় পুংকৃটুম ইন্‌ডিফেরেন্‌স্‌, মঞ্চোপযোগী নাটকের এক প্রধান অবলম্বন। যেমন 'হ্যামলেট'-এ হোরেশিও, 'ম্যাকবেথ'-এ ব্যাংকো, 'তপতী'-তে দেবদত্ত।

আর ঘটনার চমৎকারিত্ব ব্যাপারে ক্ষীরোদবাবুর মুন্সিয়ানা সর্বজন-বিদিত। প্রথম দশ লাইনের মধ্যে মোগল অন্তঃপুরের একটি ট্র্যাজেডিকে তুলে ধরা হয়েছে ; রূপকুমারীকে হারেমে আনার চক্রান্ত চলেছে ; উদিপুরী সেটা জানতে পেরেছেন। পরের দৃশ্যেই আওরংজেব এবং কয়েক লাইনের একটি স্বগতোক্তি মারফত সম্রাটের চরিত্র খোলা পুঁথির মতন আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হল। তৃতীয় দৃশ্যের শুরুটা মঞ্চে কি রকম হয় একবার আন্দাজ করুন। বাঁশি বাজল (বাঁশিকে অমন অবজ্ঞা করার কি কারণ বুঝলাম না), আলো জ্বলল ; দেখছি—

'জয়সিংহ ও ভীমসিংহ তরবারিহস্তে পরস্পরের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া দণ্ডায়মান। মধ্যে রাজসিংহ।'

একটি আশ্চর্য কলহ শুনতে পেলাম ; রাজপুত শিভাল্‌রি-গত কলহ। চতুর্থ দৃশ্যে রাজসিংহ জয়সিংহকে কাটতে উদ্যত ; গঙ্গাদাস ও বীরাবাঈ বাধা দিচ্ছেন ; জয়সিংহ ধীরভাবে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় অঙ্কেও মুহুর্মুহুঃ ঘটনা ঘটছে ; প্রথম দৃশ্যে গরীবদাস ও সুজাতা দেখছে ভীমসিংহ রাজ্যত্যাগ করেছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে দিল্লীতে আওরংজেবের চক্রান্ত ; রাজনৈতিক কাহিনীটা দানা বাঁধল। তৃতীয়

দৃশ্যটি বিখ্যাত আওরংজেব-উদিপুরীর একটি চমকপ্রদ কলহ। পঞ্চম দৃশ্যে তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় ভীমসিংহ; বীরাবাঈ কর্তৃক স্তন্যদান। তৃতীয় অঙ্কে নাটক দেখুন উদ্দাম গতি নিয়েছে; আওরংজেবের জিজিয়া করের ইস্তাহার উদয়পুরে জারী করা হয়েছে; জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজ্যত্যাগে কাতর রাণার উপর এবার মোগল আক্রমণের হুমকি এসেছে। " তৃতীয় দৃশ্যে তয়বর খাঁ ও রাজসিংহের একটি মধুর সাক্ষাৎকার। চতুর্থে কামবক্স্-রূপকুমারী কাহিনীর আরম্ভ। ষষ্ঠ দৃশ্যে রূপকুমারীর বিষপানের উদ্যোগ এবং ঠিক সেই মুহূর্তে বীরাবাঈ-এর প্রবেশ ও বাধাদান। এটা মঞ্চের পুরোনো একটি কৌশল। শেক্স্পীয়ার ("ইট ইজ আই, হ্যামলেট দা ডেন") ইবসেন ("ইওর কিন্স্ম্যান, গুডমুণ্ড্"), রবীন্দ্রনাথ (তৃতীয় দৃশ্যে মালিনীর প্রবেশ), প্রত্যেকেই এই ধরনে ঠিক সময়ে ঠিক লোকটিকে মঞ্চের উপর নিয়ে আসেন। এতে দর্শক চমৎকৃত হন। সপ্তম দৃশ্যে কামবক্স্-রূপকুমারীর সাক্ষাৎ ও কামবক্স্-এর মহানুভবতা প্রদর্শন। এই মহানুভবতাটা আসছে সম্পূর্ণ অতর্কিতে দর্শকের হৃদয় নিয়ে খেলতে। চতুর্থ অঙ্ক; আসন্ন রাজনৈতিক ঝড়ে উদ্বিগ্ন রাজসিংহ ও কামবক্স্-এর সাক্ষাৎকার; কামবক্স্-এর প্রবেশটিও পূর্বোক্ত রীতি-অনুসারে; দেখুন—

রাজসিংহ : শাজাদা কামবক্স্ শুনেছি বালক।

(কামবক্সের প্রবেশ)

কামবক্স : সে বালক আমি—।

দ্বিতীয় দৃশ্যে হাস্যরস; শাজাদা আকবরের মোসাহেব-সংসর্গে হল্লা। তৃতীয়ে উদিপুরীর ষড়যন্ত্রে পুষ্ট হয়েছে আওরংজেব-চরিত্রের আশ্চর্য নাটকীয় বিকাশ। পঞ্চমে ও ষষ্ঠে রাজপুত যুদ্ধপ্রস্তুতি, যুদ্ধ ও রূপকুমারী-উদ্ধার। পঞ্চম অঙ্কে আওরংজেবের যুদ্ধপ্রস্তুতি। দ্বিতীয় দৃশ্যে, দিল্লী-প্রাসাদে চরম নাটকীয় দৃশ্য; মাতাল উদিপুরী; কুলিশকঠোর আলমগীর; কামবক্স্-আকবর বিরোধ; ঠিক সময়ে জয়সিংহের প্রবেশ; ঠিক সময়ে ভীমসিংহের প্রবেশ; দেখুন—

আওরংজেব (জয়সিংহকে) : এইবার বল তুমি জ্যেষ্ঠ। বল বল তুমি জ্যেষ্ঠ—

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম : না সম্রাট, জ্যেষ্ঠ আমি।

এর পর থেকে নাটকের দৃশ্যগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র শাণিত হয়ে এসেছে। মোগল-রাজপুত যুদ্ধের চমকপ্রদ ঘটনাবলী, উদিপুরী-কামবক্স্ ও শেষদৃশ্যে আওরংজেব-রাজসিংহের আলিঙ্গন।

ঝোলানো সীনকে ব্যঙ্গ করলেন। কিন্তু যখন শ্রীসতু সেন-এর মঞ্চসংস্কার সত্ত্বেও বাংলা নাট্যশালায় বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, তখন ঐ ঝোলানো সীন ছাড়া আর কি দিয়ে দ্রুত পট-পরিবর্তন সম্ভব? একটি বা দুটি দৃশ্যের তো ব্যাপার নয় 'আলমগীর'; কখনো উদয়পুর প্রাসাদ, কখনো দিল্লীর, কখনো এলাহাবাদ কেল্লা, কখনো মরুপ্রান্তর, আরাবল্লী পর্বত, গুহার অভ্যন্তর; দৃশ্য থেকে দৃশ্যে ছুটছে নির্ঝরিণীর মতন; কারণ তবেই নাটক জনপ্রিয় হয়। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে দৃশ্যান্তরে যেতে না পারলে 'আলমগীর'-এর ঘটনার বন্যা বাধা পাবে, রসভঙ্গ হবে। ভগ্নপ্রায় বাংলা থিয়েটারে ঝোলানো সীন আর কাঠের খাঁজ-এ (গ্রুভ) আঁটা ফ্ল্যাট ছাড়া আর কিছুই ছিল না যা দিয়ে এ গতি-রক্ষা করা যায়। আর সে গতি সঞ্চারিত হলেই 'আলমগীর'-এর মঞ্চ-সাফল্য অনেকটা নিশ্চিত এটা মানছেন তো! অর্থাৎ নাটকটা যে রকম ঘটনা থেকে ঘটনায় প্রসারিত, তাতে মঞ্চকৌশলের সচেতন উপস্থিতি লক্ষ্য করছেন?

নাট্যকার বললেন—আর একটু অতি-নাটকীয়, এটাও অস্বীকার করা যায় না।

দার্শনিক বললেন—আর ঐতিহাসিক তথ্যের প্রচুর বিকৃতি ঘটেছে এটাও অনস্বীকার্য।

এবার খাপ খুললেন ভাষাবিদ; বললেন—ঐতিহাসিক নাটক এটা নয়। যাঁরা ক্ষীরোদপ্রসাদকে ঐতিহাসিক নাট্যপ্রণেতা বলেন তাঁরা নিতান্ত নির্বুদ্ধি। এ নাটকে তথ্যের ঐতিহাসিকতা খুঁজতে যাওয়া আর 'জুলিয়াস সিজারে' কেন ঘড়ি বাজলো সেটা অনুসন্ধান করা একই ধরনের

বোকামি। আর 'অতি-নাটকীয়' কথাটা অর্থহীন। নাটক মাত্রেই নাটকীয়; জীবন থেকে অনেক উচ্চগ্রামে বাঁধা। এখানে এত বড় বড় ব্যক্তিত্বের সংঘাত হচ্ছে, সাম্রাজ্যের উত্থানপতন হচ্ছে, এখানে ঘটনা অতি-নাটকীয় কি করে হচ্ছে? আমার তো মনে হয় ঘটনাকে এখানে যতই চটকদার করুন, সবই মানিয়ে যাবে।

নাট্যকার একটু ভেবে বললেন—হ্যাঁ বোধহয় ঠিক বলেছেন। 'নাটকীয়' বা 'অতি-নাটকীয়' সবই আপেক্ষিক। একটা ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে অতি-নাটকীয় মনে হতে পারে; কিন্তু নাটকের ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে ঘটনাটিকে দেখলে তা মনে হবে না। নাটকের অন্তস্থিত লজিকে ঘটনাটা সত্য বলে মনে হবে। এলিয়টের মতে নাট্যকৌশলের মজাই এই—

It may allow characters to behave inconsistently but only with respect to a deeper consistency.

ঐ গভীরতর সামঞ্জস্যই হল মঞ্চোপযোগী সব নাটকের মূলশক্তি। প্রচলিত যুক্তিতর্ককে পরাহত করে নাটক তার নিজের উদ্ভট যুক্তি সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। নাটক চলাকালীন কোনো প্রশ্ন আর মনে আসে না। ওথেলো কদ্দিন পর ডেসডেমোনাকে মারলেন বা হ্যামলেট কেন প্রতিশোধ নিতে দেরী করছেন, এ আরাম-কেদারার প্রশ্ন; প্রেক্ষাগৃহের সীট থেকে এ প্রশ্ন ওঠে না।

দার্শনিক বলে উঠলেন—আধুনিক নাটকে এই জাগতিক যুক্তিকে অস্বীকার করার ঝোঁক আরো প্রবল। ব্রেশট্ বলেছেন—

'Incorrectness or considerable improbability even was hardly or not at all disturbing, so long as the incorrectness had a certain consistency......All that matters is the illusion of compelling momentum in the story being told.'

সেইজন্যেই ব্রেশট্-এর নাটক পড়ে ফয়খ্ট্‌ভাংগের চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—

'The plots of his plays are full of the crassest improbabilities'

পরিচালক টেবিলে পেন্সিল ঠুকে বললেন—বন্ধুগণ! বৈদগ্ধ্য সংযত করুন। বিষয় থেকে সরে যাবেন না! 'আলমগীর' কেন অনৈতিহাসিক তার কারণ আছে। খুব সংগত কারণ আছে। আপনারা যা বললেন সবই সত্যি। কিন্তু তার ওপরেও আর-একটি জব্বর কারণ আছে। ১৯২১ সালে অভিনীত যে নাটক সে নাটকের দর্শক হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাণী শুনলে পুলকিত হবে ; তাদের ঐ বাণী শোনানো দরকার এবং শোনালে নাটক জনপ্রিয় হবে—এই ধারণারই বশবর্তী হয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ ইতিহাসকে কিছুটা মঞ্চোপযোগী করে নিয়েছিলেন। এবং নাটকের শেষে স্পষ্ট করেই বলেছেন আওরংজেবের মুখ দিয়ে—

"আলমগীরের এ মিলন-অভিলাষ হিন্দু-মুসলমানের মিলন অভিলাষ মুখর হ'ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে (অর্থাৎ জগৎ-লিখিত ইতিহাসের চোখে ধুলো দিয়ে)...... এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে হিন্দু-মুসলমানে একবার আলিঙ্গন করি।"

গভীরতর সামঞ্জস্যের তত্ত্বটা সত্য বটে ; কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য, আমার মতে, এই হাততালি-জাগানো কথাগুলো। পুরো নাটকটায়, অভিনেতারা যদি একটু ক্ষমতাবান হন, তবে অন্ততঃ সতেরো বার প্রেক্ষাগৃহ করতালিতে ফেটে পড়ার কথা। আমি গুনে দেখেছি। ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটককে জনপ্রিয় করতে কোনো ত্রুটিই রাখেন নি। অথচ বিষয়বস্তুর দিক থেকে এমন বলিষ্ঠতা দিয়েছেন যে নাটকটা প্রায় অতি-বিপ্লববাদে গিয়ে ঠেকেছে।

দার্শনিক সচকিত হলেন ; বললেন—যথা? যথা? ঐ হিন্দু-মুসলমানের মিলন-আহ্বান থেকেই আপনার ঐ উপপত্তি নাকি?

নাট্যকার বললেন—না, না, উনি আওরংজেব-চরিত্রের কথা বলছেন। যে আওরংজেবকে ইংরেজ ঐতিহাসিক আর হিন্দু বর্ণবিদ্বেষীরা মিলে দু শত বৎসর ধরে কালো, বীভৎস, শয়তান সদৃশ করে এঁকেছে, তাঁকে এই

নাটকে নির্ভীকভাবে এক বিরাট পুরুষ হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে। মাইকেলের রাবণকে নায়কোচিত করে তোলার চেয়ে এর কৃতিত্ব কোনো অংশে কম নয়।

পরিচালক বলে চললেন—শুধু তাই নয়। হাততালির অজস্র উপকরণের ফাঁকে ক্ষীরোদপ্রসাদ এমন এক মুষ্ট্যাঘাত হেনেছেন সমাজের মুখে যা নাকি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ পারেন নি স্টেজে। রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তনে' ধর্মান্ধতার বিভীষিকা দেখিয়েছেন; 'বিসর্জনে' ভয়াল দেবীমূর্তিকে পদতলে নিক্ষেপ করেছেন। ঐ প্রচণ্ড পুরুষটিই পেরেছেন! আর পেরেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। শুনুন, আওরংজেব বলছেন; রাজসিংহের উদ্দেশ্যে তাঁর এই স্বগতোক্তি—

"তোমাদের যে কোনো দেবায়তনে প্রবেশ কর। নরকের ভয় তুচ্ছ করে যদি উন্মুক্ত চক্ষে সত্য দেখতে তোমার সাহস থাকে, মন্দির মধ্যে ঐ পুতুলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যদি দৃষ্টিশক্তিহীন না হও, তখন বুঝবে যোগী, দণ্ডী, ব্রাহ্মণ, বৈরাগীর মাথার উপর কেন আমি জিজিয়া-কর স্থাপন করেছি। মূর্তির সম্মুখে, তীর্থযাত্রীর উপরে নরকের ভয় দেখিয়ে কর সংগ্রহের অত্যাচার—আর সেই জড়মূর্তির পশ্চাতে নরকের অন্ধকার-ভরা অন্তরালে কুক্ষিগত বীভৎসতা যদি তুমি দেখতে পারতে রাজসিংহ; সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ-বৈরাগীর লীলাকাহিনী কি কুৎসিত অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, যদি তুমি পড়তে পারতে রাজসিংহ তাহলে এই চিঠি লেখার ধৃষ্টতা না দেখিয়ে এই তীর্থমন্দিরগুলোকে অগ্নিসাৎ করতে তুমি আমার সাহায্যে ছুটে আসতে।

আওরংজেবকে যদি ধর্মান্ধরূপে চিত্রিত করতেন ক্ষীরোদপ্রসাদ, তাহলে বুঝতাম এ কথাগুলো সেই ধর্মান্ধতারই প্রকাশ। কিন্তু না। 'আলমগীর-'এর আওরংজেব উদারচেতা; ধর্মবিদ্বেষ তাঁর নেই। আরেক জায়গায় আওরংজেব বলছেন দিলীর খাঁকে—

"হিন্দুস্থানীর ভাষায় মোসলেমের অর্থ যদি প্রকৃত ভক্ত হয়, তাহলে মুসলমান হওয়াটা মোগল-পাঠানেরই একায়ত্ত নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীর ভিতরেও অনেক প্রকৃত মুসলমান আছে—অনেক প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত।"

তারপর বলছেন মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরকে উপহাস করে মাত্র ; তারা মুসলমান নামের অযোগ্য। সেই সঙ্গে বলেছেন—

'তবে হিন্দুরা তাঁকে যত উপহাস করে, মুসলমান আজও পর্যন্ত তত উপহাস করতে শেখেনি। হিন্দুর তীর্থ ভণ্ডে পরিপূর্ণ। মন্দির ভণ্ডামির আশ্রয়।'

আওরংজেব-এর এই কথায় ক্ষীরোদপ্রসাদের বলিষ্ঠ গোঁড়ামিহীন বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে আর এমন প্রচণ্ড বিপ্লবী কথা তিনি নির্বিবাদে দর্শককে গলাধঃকরণ করালেন কি উপায়ে? দর্শক মেনে নিল কি করে? দাংগা বাধলো না কেন? এই সেদিনও তো দেখেছি কর্ণ কুন্তী-কৃষ্ণা-বিষয়ক নাটক অভিনয় কালে ধর্মের ষাঁড়েরা লিফলেট বিলিয়েছে থিয়েটারের দোরগোড়ায়, কৃষ্ণাকে নাকি অপমান করা হয়েছে এই মিথ্যা লজ্জাকর অজুহাতে। আর ১৯২১ সালে "তীর্থ-মন্দিরকে অগ্নিসাৎ" আর "মন্দির ভণ্ডামির আশ্রয়" প্রভৃতি কথা নির্ভয়ে বলে গেলেন কি করে ক্ষীরোদ-প্রসাদ? কারণ নাট্যকৌশলে ক্ষীরোদপ্রসাদের অসাধারণ দখল। 'আলমগীর' নাটকের চমকপ্রদতা, ঘটনা-সংঘাত ; হাততালির-ঝড়তোলা সংলাপ প্রভৃতি কৌশলে আগুন ছাইচাপা পড়েছে। দর্শক নিজের অজান্তেই ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে ঐ কথাগুলো মেনে নিয়েছে। জনপ্রিয়তার মুখে ঝাঁটা মেরে ক্ষীরোদবাবু যদি নির্জলা প্রগতিবাদ উদ্গার করতেন তবে লোকে উঠে যেত, চেঁচাতো, দাংগা করত। ক্ষীরোদবাবু জনপ্রিয়তাকে নাটকের অপরিহার্য অংগ মনে করতেন। তাই অমন বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখতে পেরেছেন। দেখছেন? নাটকের জনপ্রিয়তা বক্তব্যকে চেপে তো দেয়ই না, বরং সোচ্চার হতে সাহায্য করে। আজকালকার নাট্যকাররা রবীন্দ্র-ক্ষীরোদের এই কৌশলটা এদ্দিনে শিখতে পারলেন না, এ বড়ই পরিতাপের বিষয়।

আর-এক রাউণ্ড চা-কেক নিয়ে এল কেষ্ট.; পরিচালক অমনি আহারে মাতলেন। মিনিট-পাঁচেক আর-কোনো কথা নেই, শুধুই পানাহার। তারপর নাট্যকারের দেয়া একটা চুরুট নিয়ে বললেন—এবার আসা যাক

'আলমগীরের' সাহিত্যে, তার কাব্যস্ফুরণে। নাটকের সাহিত্যরস নাটকের উত্থানপতনের সঙ্গে জড়িত, এটা স্মরণ রাখতে হবে। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে, একটা বিশেষ ঘটনাচক্রে সংলাপগুলোকে ওজন করে দেখতে হবে। নিছক একটি কবিতা কেউ খুঁজে পাবেন না নাটকে। প্রথমেই চোখে পড়বে বাগ্মিতা, রেটোরিক। সেটাও অভিনেতার মুখে আবৃত্তির জন্যে লেখা ; তাই কোন চরিত্রের মুখে কোন অবস্থায় সেটা বসান হয়েছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। আধুনিক বাংলা নাটকের অধিকাংশই এই এককথায় সাহিত্যের আওতা থেকে বাদ পড়বে। কারণ আধুনিক নাট্যকাররা স্বাভাবিকত্বের নাম করে নাটক থেকে বাগ্মিতা, কাব্য সব বিসর্জন দিয়েছেন। এমনকি স্বগতোক্তি পর্যন্ত এখন প্রায় নিষিদ্ধ। তাঁরা জীবনকে নাকি যথাযথ প্রতিফলিত করছেন ; আর জীবনে মানুষ নাকি কাব্যি করে কথা বলে না। অতএব মানবমনের না-বলার বৃহৎ জগৎটা এঁদের নাগালের বাইরে। কিন্তু মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই এই বাগ্মিতার আশ্রয় নিয়ে চরিত্রের মনের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। একটা বিশেষ আবেগে অস্থির হয়ে এঁদের চরিত্ররা হঠাৎ যেন নিজেকে দেখতে পায়, আত্মোপলব্ধি করে। সেই আত্মোপলব্ধিই ঝরে পড়ে কাব্যসুষমাময় ভাষায়। সেটা জীবনানুগ কি না এটা বড় কথা নয়। কিন্তু সেটা যে জনপ্রিয় ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আধুনিক জীবনানুগ বোবা, তোতলা চরিত্ররা সে জনপ্রিয়তার ধার ঘেঁষেও যেতে পারছে না।

কয়েকটা জনপ্রিয় উদাহরণ আগে দেয়া যাক। লক্ষ্য করবেন, এর প্রত্যেকটাই আবেগমুহূর্তে চরিত্রের উচ্ছ্বাস-প্রকাশ।

মাইকেলের কৃষ্ণকুমারীকে এক ছদ্মবেশী দূতী এসে প্রিয়তমের খবর দিয়ে সরে পড়েছে। কৃষ্ণকুমারী বলছেন—

'এ যে কি মায়াবলে আমাকে উতলা ক'রে গেল আমি তা কিছুই বুঝতে পাচ্যি নে। হা রে অবোধ মন, কেন বৃথা এত চঞ্চল হোস। নিশার স্বপ্ন কি কখন সফল হয় ?'

'নীলদর্পণে' মহাসর্বনাশে বসুপরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সরলতা বলছেন—

'এই ঘোর রজনী, সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত; আকাশমণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; বহ্নিবানের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত; প্রাণীমাত্রেই কালনিদ্রারূপ নিদ্রায় অভিভূত।'

'মালিনীতে' বন্দী ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে ভৎর্সনা করতে গিয়ে বলছেন, মালিনীর মোহে আমিও তো আকৃষ্ট হতে পারতাম, হয়েছিলামও—

'অপূর্ব সংগীতে
বক্ষের পঞ্জর মোর লাগিল কাঁদিতে
সহস্র বংশীর মতো—সব সফলতা
জীবনের যৌবনের আশাকল্পলতা
জড়ায়ে জড়ায়ে মোর অন্তরে অন্তরে
মঞ্জরি উঠিল যেন পত্রপুষ্পভরে
এক নিমেষের মাঝে।'

'আলমগীরে' উদিপুরী মদ্যপান করছেন আর নিজের মনেই বলছেন—

'আজ কি আমি বিষাদকে হাসাতে সরাব খাচ্ছি রে? খাচ্ছি উল্লাসকে কাঁদাতে। নইলে সে এখনি আমাকে মেরে ফেলত। বুকের ভিতরে পশে তুলেছে সে এমন পাষাণ-চূর্ণ করা বিদ্রোহ।'

প্রথমটি আত্মবিলাপ, দ্বিতীয়টি চরিত্রদের দুঃখে তাদের ভীষণ দুর্দৈবে প্রকৃতির অংশগ্রহণ—প্যাথেটিক ফ্যালেসি, তৃতীয়টি (কবিত্বতে এটি স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ) সরাসরি সংলাপ; চতুর্থটি আত্মোপলব্ধি। প্রধানত এই চার রকম ক্ষেত্রে বাগ্মিতাপূর্ণ, কাব্যময় ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নাটকীয়ত্বে চতুর্থই যে শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে বোধহয় সন্দেহ থাকতে পারে না। নায়ক যখন নিজেকে চিনতে চেষ্টা করে তখন যেমন একটা বিষাদের ভাব স্বভাবতই জেগে ওঠে; তেমনি প্রচ্ছন্ন থাকে একটা নৈর্ব্যক্তিক হাসি যেটা সেই বিষাদকে আরো উজিয়ে দেয়। 'তপতীতে' বিক্রম বলছেন

'তুমি আমাকে চিনতে পারলে না—তোমার হৃদয় নেই নারী। শংকরের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করতে পারো কি। সে তো অপ্সরার নৃত্য নয়। আমার প্রেম, এ প্রকাণ্ড, এ প্রচণ্ড ; এতে আছে আমার শৌর্য—আমার রাজপ্রতাপের চেয়ে এ ছোটো নয়।'

এ কথার মধ্যে সত্যভাষণ কতটা, দম্ভ কতটা, আর নিজেকে উপহাস কতটা, একবার ভেবে দেখবেন। তেমনি একটা সংলাপের টুকরো দেখুন 'আলমগীর' থেকে—

'উদিপুরী : আমি দেখছি আপনার ভিতর দুটো মানুষ আছে। একটা নকল আলমগীর, একটা আসল। নকলটা যখন ঘুমোয় তখন আসলটা জাগে। আবার নকলটা যখন জাগে, তখন আসলটা গভীর নিদ্রায় ডুবে যায়। বাইরে তার অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন থাকে না।

আওরংজেব : না, কেন? তা হলে নকলটাকে তোমারই সুমুখে শেষ করি? (অস্ত্রদ্বারা আত্মহত্যার চেষ্টা)

উদিপুরী (অস্ত্র ধরিয়া): জাঁহপনা! এইবারে দেখছি দেবদূত আপনার জাগ্রত চৈতন্য আক্রমণ করলে।

আওরংজেব (শয়ন করিলেন): যাও, আমার মরা হয়েছে। তুমি আমার জীবিতেশ্বরী।'

স্পষ্ট একটা চাপা হাসি শুনতে পাচ্ছেন? নিজেকে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে হাসি পেতে বাধ্য। উচ্চ কান্নার মধ্যেও সে হাসি শোনা যেতে বাধ্য। কথাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে? তবু এটা সত্যি। নিজেকে দেখার তৃতীয় চক্ষু উন্মিলীত হলে নিজের দুঃখকে বাঁচবার লড়াইকে হঠাৎ হাস্যকর লম্ফঝম্ফ মনে হয়। সেই তৃতীয় চক্ষু পেয়েই লিয়ার গভীর দুঃখে বলে ওঠেন—

'Is man no more than this? Consider him well: Thou owest the worm no silk, the beast no hide, the sheep no wool, the cat no perfume—Ha! here's three of us are sophisticated,'

এই একই আত্মোপলব্ধিতে কবি বলে ওঠেন—

'করিয়াছি বীণার সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি,
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস
পরিহাস করি!'

ভাষাবিদ বললেন - থিওফিল গোতিয়ে বলছেন একই সুরে : আমাদের দুঃখ দেখে ভগবান হাসেন নাকি?

'ক্রোইয়ে ভূ দঁ কে দিয়্যু সা' মুক্ত আ ভোয়া সুফ্রির?"

পরিচালকের চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, চুরুট নিভে গিয়েছিল। কিন্তু উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন বলে ওসব গ্রাহ্য না করে বলে চললেন—তেমনি আওরংজেবেরও তার ব্যঙ্গের সুরে নিজেকে কশাঘাত করা :—

'আওরংজেব : স্মৃতিপথের মাঝে এক একবার ওই মেয়েটা এসে দাঁড়াচ্ছে।

দিলার : কে মেয়ে?

আওরংজেব : সেটা যে, কোথাকার, কি, কেন—শ্যামসিং চলে গেল?

দিলার : তাকে ডেকে আনব।

আওরংজেব : না, যখন চলে গেছে, তখন আর তাকে প্রয়োজন নেই। সে থাকলে বলতুম। তখন স্মরণে এল না। আমিই সে মেয়েটার ঘটকালি করতুম। তার যোগ্য পাত্রের সন্ধান বলে দিতুম। তার পর নিজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতুম।'

আবার শুনুন নির্মম আত্মপরিহাস—

আওরংজেব : আমার রূপও নেই, যৌবনও নেই। কিন্তু আছে জগতের সবশ্রেষ্ঠ আসন তক্তাউস, আর তার চার পাশ ঘিরে আসমুদ্রহিন্দুস্থান। এ যার আছে তার রূপও আছে, যৌবনও আছে।"

আবার শুনুন সে হাসি প্রায় উন্মাদের অট্টহাসিতে পরিণত হয়েছে—

"আওরংজেব : মক্কা যাবার পূর্বে আমি একবার দেখে যাই, সমস্ত হিন্দুস্থান আমার পদানত হয়েছে। (ঊর্ধ্ব দৃষ্টি) যাও—তুমি কাফের—তুমি কাফের। তুমি কাফের। (অপ্রকৃতিস্থ ভাব)

দিলীর (সক্রোধে) : কে? আমি জাঁহাপনা? (তরবারি স্পর্শ)

আওরংজেব (প্রকৃতিস্থভাবে) : না ভাই—তুমি শ্রেষ্ঠ মুসলমান। আমি আমার অন্তরের সংশয়টাকে গালি দিচ্ছি।

এই হাসি-মেশান খেদোক্তি জনপ্রিয় নাটকের শক্তিশালী এক অংগ! বোধহয় নিজেকে বাইরে থেকে দেখার সংগে দর্শকের দেখাটা এক হয়ে যায়। দর্শকের অন্তরস্থিত আবেগটাকেই বোধহয় ঐ ধরনের বাগ্মিতায় প্রতিধ্বনিত করা হয়। কারণ সবচেয়ে করুণ, সবচেয়ে নাটকীয় যে দৃশ্য তাতেও দর্শকের হাসি ক্রমান্বয়ে বেরুবার রাস্তা খুঁজতে থাকে। করুণ দৃশ্যে সামান্যতম বিচ্যুতি যে অভিনেতার ঘটেছে তিনিই এর সাক্ষী; দর্শক সুযোগ পেয়েই হেসে উঠেছে। সেই হাস্য-সম্ভাবনাটাকেও নাটকের কাজে লাগাবার এই এক উপায়; উদ্যত হাসিটাকে বিষাদের পথে চালিত করে দেয়ার উপায় এই আত্মোপলব্ধির করুণ হাসি। নিজের হাসিটাকে মঞ্চের ওপরই এমন অশ্রুসিক্ত হতে দেখে দর্শক আশ্বস্ত হন; ট্র্যাজেডির দিকে তাঁর মন আরো একাগ্রভাবে নিবদ্ধ হয়। এইখানেই 'হ্যামলেটে' দুই করুণ ভাঁড়, গ্রেভ ডিগারদের সার্থকতা; এইখানেই 'কিং লিয়ারের' বিখ্যাত ভাঁড়-এর কৃতিত্ব; এইখানেই 'তপতী'-র শেষ দৃশ্যে থমথমে আবহাওয়ায় দেবদত্তের পরিহাসের তাৎপর্য। এই মনস্তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই মসিয়্য ভের্হ্র স্থষ্টি। হাসিকান্নার সীমারেখাটা অতি ক্ষীণ।

উল্লিখিত চার রকমের বাগ্মিতাই 'আলমগীর'-এ বর্তমান; কিন্তু নাটকের চরম মুহূর্তগুলিতে আত্মোপলব্ধির হাসিটাই বেশি।

এই পর্যন্ত বলে পরিচালক আর-একবার দম নিলেন। সেই ফাঁকে নাট্যকার বললেন—পুরো 'আলমগীর'কে আপনি মঞ্চোপযোগিতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করছেন। সাহিত্যের পরিসর আরো বৃহৎ। নাটক হয়েও আরো একটা কিছু হতে হবে 'আলমগীর'কে; তবে সে সাহিত্যপদে উঠতে পারে। মঞ্চকে অতিক্রম করে হ্যামলেট চিন্তারাজ্যের বৃহত্তম প্রতিচ্ছবি হিসেবে পরিচিত হয়েছে বলেই না সে সাহিত্য।

পরিচালক বললেন—তবে আরো চা বলুন; রিহার্সালটা তো গেছেই। আড্ডার এই পরিণাম!

আমরা হাঁকডাক করে চা আনালাম। খানিক চা খেয়ে পরিচালক বললেন—নিশ্চয়ই। 'আলমগীর'ও নাটক হয়ে আরো কিছু। কি সেটা?

অত সহজে সেটাকে নির্দিষ্ট করা যাবে না। তবু চেষ্টা করলে খানিকটা পারতেও পারি। চিন্তা স্বভাবতই একটু উচ্ছৃঙ্খল। স্বপ্নালু। শিল্পের কাজ হল সেটাকে নিয়মে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আপনার মাঝে তাই পেতেছি প্রমাণ—
স্বপ্নের এ পাগলামি বিশ্বের আদিম উপাদান।
তাহারা দমনে রাখে, ধ্রুব করে সৃষ্টির প্রণালী
কর্তৃত্ব প্রচণ্ড বলশালী।
শিল্পের নৈপুণ্য এই উদ্দামেরে শৃঙ্খলিত করা,
অধরাকে ধরা।"

নাট্যকারের কাব্যস্বপ্নও যদি শিল্পশৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে, তবেই তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। নচেৎ ইতস্ততঃ-বিক্ষুব্ধ স্বপ্নালুতায় সে কাব্য ব্যর্থ হবে। নাটকের বৃহৎ পঞ্চাংক পরিসরে সে ভাবালুতা ছড়িয়ে পড়ার প্রচুর জায়গা পায়, এবং সুযোগ পেলেই ছড়িয়ে পড়ে সে নিজেকে ধ্বংস করে। এ ধরনের ব্যর্থ কাব্যের নিদর্শন বহু নাটকেই পাওয়া যাবে। শৃঙ্খলা ও কেন্দ্রিকতার অভাবে মুহুর্মুহুঃ উপমা-আদি নিজেদের গলা কেটেছে; স্বভাবকবি যে নাট্যকাররা তাঁদের নাটকে এ ঘটতে পারেনি। 'কৃষ্ণকুমারী' একটা পদ্মফুলকে ঘিরে রচিত বলে প্রতীত হয়; সেই পদ্মের মূর্তিকল্প, সে পদ্মের সৌরভ সারা নাটকে নিজেকে ব্যাপ্ত করেছে; সেই সৌরভই শৃঙ্খলের কাজ করেছে। আরেক দিন এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রকৃতি আর ঋতুতে ঘেরা; বর্ষার আমেজ 'অচলায়তনকে' আগাগোড়া সংহত করেছে; বর্ষার রূপ, বর্ষার উপমা নাটকের কাব্যকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। তেমনি 'রক্তকরবী'কে করেছে শীত।

'আলমগীর'-এর কাব্যকে বেঁধেছে কে? আমার মতে, একটা তৃষ্ণা, মরুভূমির একটা জ্বলন্ত রূপ। জলের তৃষ্ণায় ছটফট করছে নাটকের প্রত্যেকটা মানুষ। সে জল, সে রস শুধুই জল নয়। সে মরুপ্রান্তর শুধুই ভৌগোলিক মরুভূমি নয়। না বাধা দেবেন না; জানি এটা

প্রমাণসাপেক্ষ ; প্রমাণ দিচ্ছি। প্রমাণ করব যে এই মরুতৃষ্ণা নাটকের কাব্যকে ঐক্য দিয়েছে, নাটকের প্রত্যেক চরিত্রকে কাব্যময় করেছে, তাদের নিছক পার্থিবতা ঘুচিয়ে তাদের করেছে কাব্যস্বপ্নের প্রতীক।

ভীমসিংহের অভিমান যে তার জ্যেষ্ঠতা গোপন ক'রে তার দেবতুল্য পিতামাতা তাকে প্রতারিত করেছেন। সেই অভিমানের কি উপমা দিচ্ছে সে ?

'সে অভিমান দারুণ বজ্রের প্রহারের মত; শিলাবিদ্রাবী আগ্নেয় গিরিগহ্বরের উত্তাপের মত......শতসূর্যের প্রখরতায় দীপ্ত।'

পিতামাতার রস থেকে বঞ্চিত হয়েছে যে, তার অভিমান উত্তাপের মতন। অতএব স্বেচ্ছায় সে চলে গেল রাজ্য ছেড়ে মরুপ্রান্তরে। অন্তরে যে অতৃপ্ত তৃষ্ণা তাই এবার প্রত্যক্ষ, দৈনিক তৃষ্ণায় পরিণত হয়ে তাকে পোড়াচ্ছে। রাণা রাজসিংহ তার সম্বন্ধে বলছেন—

'গঙ্গাদাস !......তাকে একবিন্দু জল খাওয়াতে পারো ? একবিন্দু—একবিন্দু ? নিদাঘে চাতক যা পাবার জন্যে আকাশপানে চেয়ে আর্তনাদ করে। পিতৃপুরুষ যা পাবার জন্য উন্মত্ত ঝঞ্ঝায় হাহারবে ঘুরে বেড়ায়—একবিন্দু ?'

স্বেচ্ছায় সে নিজেকে মরুপ্রান্তরে নির্বাসিত করেছে ; তাকে জল খাওয়াতে পারলে তার প্রতিজ্ঞা ভাঙবে। রাজসিংহ বলছেন :

'দোবারির এপারে অগাধ জল-রাশি !......কিন্তু ও পারে ? কি শুষ্ক কি কঠোর কি উত্তপ্ত শিলাপ্রান্তর !'

এ শিলাপ্রান্তর শুধুই রাজস্থানের ভৌগোলিক বর্ণনা নয় ; এ ভীমসিংহের উত্তপ্ত অভিমানেরই মূর্ত রূপ। তাই সেখানে সে স্বেচ্ছায় তৃষ্ণায় মরতে চাইছে। বাঁচাল কে ? যে রস থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত মনে করেছিল সেই রস, বীরাবাঈয়ের স্তনদুগ্ধ।

"বীরাবাঈ : এই নাও : দোবারির ওপারে নয়, এ পারে। জল নয়, দুগ্ধ......এ তোমার বিমাতার নির্মল স্নেহরসের প্রতিনিধি।'

ভীমসিংহের কাছে পিতামাতা রসের উৎস ; মরুপ্রান্তর তার অভিমান।

ক্ষীরোদপ্রসাদের এই মরুপ্রান্তর যে কোনো ভৌগোলিক প্রান্তর নয় তার প্রমাণ দিল্লীর দৃশ্যগুলিতে উদিপুরীর কথা, আওরংজেবের কথা। উদিপুরী বলছেন আওরংজেবকে—

'কাশ্মীরের সেই......অপূর্ব আধার হ্রদের কথা আপনি স্মরণ করুন। যে দিন সে বিশাল জলাশয় আমাকে তার অঙ্গ স্পর্শ করতে দেখে অগণ্য হিল্লোলে আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।'

এর পরেই নিজেকে পর পর 'জলচারিণী', 'জলকেলিরতা', 'চক্ষুতারকায় সেই হ্রদের গাঢ় নীলিমা' প্রভৃতি বলে বর্ণনা করছেন। উদিপুরী একদিন ছিলেন মূর্তিমতী সুধাধারা, জলস্রোত। আওরংজেবও সেটা স্বীকার করছেন পরোক্ষে; বলছেন—

'আলমগীর ভণ্ড-জগতের উপর খড়্গহস্ত—কুটিলতা তার চক্ষুশূল। কিন্তু উদার সরলতার সম্মুখে সে তরল জলধারার কাছে বেতস লতার ন্যায় নমনীয়।'

কিন্তু আলমগীর প্রচণ্ড; আলমগীর মূর্তিমান বহ্নি: আলমগীরের প্রতাপে উদিপুরীর জলস্রোত মরুপ্রান্তরে হারিয়ে গেছে। উদিপুরী বলছেন—

'উৎসব করতে গিয়ে চোখের কোণ দিয়ে কতকগুলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ... উঃ! কি বেগেই না তারা ছুটলো—আমার উৎসবের সমস্ত আয়োজন পুড়িয়ে দিলে।'

এবং অবশেষে অপমানের মরুপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে জলচারিণী উদিপুরী স্পষ্টই বলছেন তয়বর খাঁকে—নিজের চোখের দিকে দেখিয়ে

'এ মরুভূমিতে এর পূর্বে আর কখন কি জল দেখেছিলে?'

ক্ষীরোদপ্রসাদের মরুপ্রান্তর উদিপুরীর অপমানের মূর্ত রূপ। পুরো দিল্লীই যেন সেই মরুপ্রান্তরে পরিণত হয়েছে; রাজসিংহ হঠাৎ বলে উঠেছে—

'তপ্ত দিল্লীর মাটিতে পা দুটো যে পুড়ে ছাই হবার যোগাড় হ'ল।'

শেষ পর্যন্ত নিজেরই পৌরুষের আগুনে সৃষ্ট মরুপ্রান্তরে আটকা পড়লেন আওরংজেব স্বয়ং। বলে উঠলেন—

'পিপাসার্ত আলমগীর! জল জল—আত্মার পিপাসা—চাই জল... বুঝি আত্মা চেয়েছিল সত্যের ঝরণা থেকে ঝরা জল! কেউ দিতে পারলে না!'

আবার সেই তৃষ্ণা! ভীমসিংহের তৃষ্ণারই এ প্রতিধ্বনি! এবারও রসের তৃষ্ণা। সত্যের তৃষ্ণা। ভণ্ডামিতে-ভরা মরুপ্রান্তরে আওরংজেব-এর আত্মা বন্দী। অনতিবিলম্বে তিনিও ভীমসিংহের মতন দেহের তৃষ্ণায় আক্রান্ত হলেন। ভৌগোলিক মরুপ্রান্তরে আটকা পড়ে আলমগীর বলছেন—

'গুহা আমাকে পিপাসা দিয়ে আক্রমণ করেছে। মনে করেছে আমি কাফেরের জল গ্রহণ করবো।'

শেষে জল নিলেন সত্যাশ্রয়ী ভীমসিংহের হাত থেকে; জলপান করে হেসে বললেন—

'দেখছ কি গুহা-রাক্ষসী, আমি কাফেরের জল গ্রহণ করিনি।'

এই জলের জন্যেই তো অপেক্ষা করছিলেন আলমগীর; এই তো সত্যের ঝরণার জল; মিলনের জল। এই জল পান করেই তো রাজসিংহকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মুসলমান সম্রাট। আওরংজেবের তৃষ্ণা এই সত্যরসের জন্য; মরুপ্রান্তর তাঁর কাছে বিরোধ আর অসত্যের জগৎ।

তৃষ্ণার জল আর মরুর উত্তাপ পুরো নাটকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কামবক্স্ রূপকুমারীকে যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়ে বললেন—

'দেখছি যেন চাঁদিনীমাখা দরিয়ার উথলে ওঠা তরঙ্গ।'

তৃষ্ণার্ত কামবক্স্। রূপকুমারী তার জলস্রোত।

বীরাবাঈ এসেছেন, রক্ষা করেছেন রূপকুমারীর প্রাণ; বলছেন—

তুর্কীর সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা শুনে এ নগরে জলস্পর্শ করব না সঙ্কল্প করেছিলুম। আমি বড় পিপাসার্ত, আমাকে একটু জল দাও।'

কিসের পিপাসা? রূপকুমারীকে রক্ষা করেই তার সতীত্ব রক্ষার কথা ভাবছেন বীরাবাঈ; সংকল্প করেছেন নিজের স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দেবেন; বলছেন—

'স্বর্গে গিয়েও যে সতীন উষ্ণ নিঃশ্বাসের জ্বালায় অস্থির ক'রে আমাকে গৃহ ছাড়িয়েছে ; পথের মাঝে সেই সতীনের কলেবর ধ'রে আমারই কাঁধে ভর করলে।'

উষ্ণ নিঃশ্বাস! সবকিছু ছেড়ে মরুর ক্লেশকে স্বীকার করাতেই বীরাবাঈয়ের আনন্দ। তাই তিনিও প্রত্যক্ষ মরুপ্রান্তরে প্রবেশ করে ভীমসিংহের মা হলেন।

এমনকি ক্ষুদ্র চরিত্র আকবর, সেও মোসাহেবদের সঙ্গে মদ খেতে খেতে ভাবছে, বাঙালায় যাওয়া কেন দরকার। একজন মোসাহেব বলে দিল—

বাঙ্গালার মাটিতে রস আছে।

আকবর: নদী সেখানে উজান বয়।

৩য় মোসাহেব: এটা আমাদের দেখতে হবে। শুধু দেখতে হবে কেন—হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ভাসতে হবে।

২য় মোসাহেব: যেহেতু শাজাদার বয়সটাতে কিছু উজান বহাবার প্রয়োজন হয়েছে।'

আকবর তৃষ্ণার্ত। তারও উজানের প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের নির্মম লেখনীর কাছে নিস্তার নেই। তাকেও রাজ্যলোভে মরুভূমিতে যেতে হল রাজনৈতিক মরুপ্রান্তরে, প্রত্যক্ষ ভৌগোলিক মরুভূমিতে।

একটু থেমে পরিচালক বললেন—দেখতে পাচ্ছেন? একটা মরু-তৃষ্ণার জ্বালায় প্রায় প্রতি চরিত্র ছটফট করে মরছে। তারই প্রত্যক্ষ প্রতীক হিসেবে আসছে রাজস্থানের মরুভূমি। এ মরুকল্পনাই পুরো নাটকের কাব্যকে নিয়ন্ত্রিত শৃংখলিত করে শিল্পে উন্নীত করেছে। প্রতি চরিত্র তাই শুধুই একটা কাহিনীতে, একটা জাগতিক ছকে আবদ্ধ না থেকে, সংকেতে ভরে উঠেছে, বাঙময় হয়েছে, কাব্যকল্পনার প্রতীক হয়েছে। উইলসন নাটক সম্বন্ধে বলেছেন—

The persons, ultimately, are not human at all, but purely symbols of a poetic vision.'

এ কথা 'আলমগীর' সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। দেখেছেন? ভালো নাটক একাধারে জনপ্রিয় এবং কাব্যময় হয় কি করে? 'আলমগীর'এর মতন নাটক পেলে আমার মতন ক্ষুদ্র জীবের কলম চালাবার প্রয়োজন হয় কি?

হ্যামলেট ও জনপ্রিয়তা

সেদিন পরিচালক এক দীর্ঘ নিবন্ধ লিখে এনে আমাদের পাঠ করে শোনালেন। বললেন—একটা ফ্যাশান ' আছে—ফ্যাশান অথবা রাজতোষণ যাই বলুন না কেন—ব্যর্থ নাট্যকারদের ফ্যাশান। মুখে চুরুট বা সিগারেট গুঁজে তাঁরা বলে ওঠেন—ভালো নাটক আর জনপ্রিয় নাটকে আছে বিরাট বিরোধ। এ চীনের প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য। সত্যিকারের ভালো নাটক লিখলেই দর্শক সেটাকে বয়কট করেন। আর বাজে নাটক লিখলে তাঁরা আদর করে গ্রহণ করেন। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁরা নিজের নামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, মেতেরলিংক প্রভৃতির নাম যুক্ত করে এই সিদ্ধান্তে আসেন—একদিন না একদিন এঁরা তিন জন নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় সব শিল্পস্রষ্টার মধ্যে একমাত্র নাট্যকারকেই চলতে হয় একান্তভাবে বর্তমানকে স্বীকার করে। এখন আমাকে কেউ না বুঝুক, ভবিষ্যতে বুঝবে—এ কথা নাট্যকারের মুখে অসার দম্ভোক্তির মতন শোনায়। প্রতি মুহূর্তে দর্শকদের প্রত্যক্ষ সমালোচনায় নাটক উত্তীর্ণ বা ব্যর্থ হয়—অভিনেয় নাটককে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতেই হয়। তাই জনপ্রিয়তা আর উৎকর্ষ (নাটকের বেলায়) অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অবশ্যই জনপ্রিয় হতে গেলে নাটককে কিছু চাহিদা মেটাতেই হয়। কিন্তু তাবলে এই চাহিদা মেটানর জন্য কি দর্শকের হীনতম প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করে যেতে হবে? জনপ্রিয়তার অজুহাতেই তো বোম্বাই-মার্কা ছবির সব উচ্ছৃঙ্খলতার ভিত্তি! নাকি, জনপ্রিয়তার চৌহদ্দির মধ্যেই ভবিষ্যতের দিশারি নাটক সৃষ্টি হয়, চিরকাল হয়েছে? কালকে স্বীকার করেই কালজয়ী ক্ল্যাসিক সৃষ্টি হয়। জনপ্রিয়তাকে উন্নাসিকের মতন অবজ্ঞা করলে শুধু অর্থহীন পরীক্ষানিরীক্ষা চলবে যার সঙ্গে মানুষের যোগ ক্ষীণ থেকে

ক্ষীণতর হয়ে যাবে। জনপ্রিয়তাকেই লক্ষ্য করে তোলা যেমন চলে না, তেমনি জনপ্রিয়তাকে বাদ দিলেও চলে না।

আমরা 'হ্যামলেট' নাটক নিয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করব। 'হ্যামলেট' যে শ্রেষ্ঠ কালজয়ী সৃষ্টি এ বিষয়ে বোধহয় মতভেদ নেই। হ্যামলেট-চরিত্রের গূঢ় তাৎপর্য নিয়ে এখনো পর্যন্ত পণ্ডিত-মহলের গবেষণার শেষ নেই। নাটকের গভীর মানবতাবাদ এখনো আমাদের অভিভূত করে। রেনেসাঁস যুগের মানববন্দনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হ্যামলেট। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বলিষ্ঠতম ঘোষণা হ্যামলেট। মরণোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের জঘন্যতম ছবি 'হ্যামলেট'। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রতীক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতীক, আঘাতে পরান্মুখ মানবদরদী চিত্তের প্রতীক হ্যামলেট। রক্তপাতে, যুদ্ধবিগ্রহে বিতৃষ্ণ হ্যামলেট চিরন্তন বুদ্ধিজীবীর প্রতিমূর্তি—আপনার ব্যথায় আপনি মথিত, জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন—নিঃসঙ্গ বিদ্রোহী হ্যামলেট। এত জটিল, এত গভীর চরিত্র আজ পর্যন্ত সৃষ্ট হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। মহাপণ্ডিতরাও এখনো সম্যক মেপে উঠতে পারেন নি হ্যামলেটের বিভিন্ন দিক। নিত্য নূতন বই বেরুচ্ছে, নিত্য নূতন অভিনয় হচ্ছে।

কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়ার কি তাঁর দর্শককে অস্বীকার করেছিলেন? কত টিকিট বিক্রী হল এটা কি ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল? না, তৎকালীন দর্শক যা চাইত সব দিয়েও হ্যামলেটকে নিয়ে গেলেন সব চাওয়ার উপরে? 'হ্যামলেট'-এর যে বিপুল জনপ্রিয়তা সে যুগে—তার কারণ এ নয় যে, দৈববলে ১৬০২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এমন দর্শক ছিল যারা 'হ্যামলেট'-এর গভীরতার তাৎপর্য উপলব্ধি করে ফেলেছিল। আসলে এই জনপ্রিয়তার কারণ—সাধারণ দর্শককে খুশি করার সব উপাদান রয়েছে 'হ্যামলেট'-এ। ১৬০২ সালের লণ্ডনকে ভালো করে চিনতেন শেক্‌স্‌পিয়ার; দর্শককে টানবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর; এবং তারা যা চায় অকাতরে সেসব সন্নিবিষ্ট করতে পিছপা হতেন না শেক্‌স্‌পিয়ার। জনতার ছোঁয়া লেগে 'হ্যামলেট' অশুদ্ধ হবে এ ধরনের দম্ভ ছিল না তাঁর।

সে যুগের দর্শক

রেনেসাঁসের লণ্ডন—এক বিচিত্র স্থান। লেখা পাওয়া যায় প্রচুর; স্পষ্টই প্রতিভাত হয় মানুষগুলির চেহারা। সবচেয়ে দলভারী ও সদর্প শ্রেণী ছিল অ্যাপ্রেনটিসরা—সদ্য গড়ে-ওঠা অসংখ্য ছোট ছোট শিল্পায়তনের মজুররা। এদের বিরুদ্ধে অভিজাত ও হঠাৎ-বড়লোক শ্রেণীর আক্রোশের শেষ নেই। কথায় কথায় বলছেন তাঁরা—কি দিন কাল পড়েছে! ছোটলোকরা এখন বাবু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গায়ে ঢলে পড়ছে! হ্যামলেটও বলছেন:

By the Lord, Horatio, this three years I have taken note of it, the age is grown so picked, that the toe of the peasant comes so near the heel of our courtier, he galls his kibe.'

অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিষ্কর্মা যুবকের দল গাড়ি হাঁকিয়ে লণ্ডনের রাস্তা সরগরম করে রাখতেন। ফাইন্‌স্ মরিসন তাঁর 'ইটিনেরারি' (১৬১৭) গ্রন্থে বলছেন—বড় রাস্তায় হাঁটা দায় হয়েছে, এত জুড়ি-গাড়ীর ভীড়! লণ্ডনের বাইরে সড়কের উপর যে ডাকাতির পশরা বসেছিল এই বেকার ধনীরা ছিল তার পাণ্ডা। ফল্‌স্টাফ্ ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা এই রকমই একটি দল। জন আর্ল তাঁর 'মাইক্রো-কস্‌মোগ্রাফি' (১৬২৮) গ্রন্থে স্পষ্ট বলেছেন—লণ্ডনের বাইরে তো বটেই ভেতরেও পল্‌স্ ওয়াক প্রভৃতি সড়কে দিনেদুপুরে এই অভিজাতরা দাঙ্গা, ডাকাতি, জুয়া ও মদের আড্ডা বসাতেন। কথায় কথায় দস্তানা খুলে তাই দিয়ে এক চড় বসাতেন আর-একজনের গালে—অর্থঃ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার খুলে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ! রাত্রে ছিল নারী নিয়ে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা। শুঁড়িখানাগুলোকে বলা হত ট্যাভার্ন। রাত্রে এখানে বইত মদের স্রোত ও দেহোপজীবিনীদের গান আর হাসি। ডেকার তাঁর 'সেভেন ডেড্‌লি সিন্‌স অফ লণ্ডন' (১৬০৬) গ্রন্থে কাব্যময় ভাষায় বলছেন—রাতই হল এই বড়-লোকদের লীলার সময়; অন্ধকারই এদের বন্ধু।

ডেকার-এর বর্ণনাই শ্রেষ্ঠ। দিনের বেলায় লণ্ডনের সড়ক বর্ণনা করছেন—বাড়ির থামগুলো কেন দেয়া হয়েছে জানো? নইলে ভীড়ের ধাক্কায় বাড়িগুলি ধ্বসে যেত। কামারশালের হাতুড়ির শব্দ আর ধাতুর বাসনের ঝনৎকারে কান পাতা ভার। কুলিরা ছুটে চলেছে—পিঠে টাকার বোঝা; পেছনে চলেছে তাদের প্রভুরা—বড় বড় সব সওদাগররা। দোকানে দোকানে ভীড়। আর সবাইকে এড়িয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে ফিরিওলার দল।

চীপসাইড দরিদ্রতম অ্যাপ্রেনটিসদের অবাসস্থল। তার ভীষণ ছবি এঁকেছেন ডোনাল্ড লাপটন তাঁর 'লণ্ডন' (১৬৩২) গ্রন্থে। বলেছেন—এখানে কিছু মেয়ে এখনো সতী আছে। তবে সে শুধু সুযোগের অভাবে। তারপর বিখ্যাত লণ্ডন ব্রীজ প্রসঙ্গে অবলীলাক্রমে বলছেন—ওখানে আর যাওয়া যায় না; ছোটলোকেরা বড় জ্বালায়!

স্যার টমাস ওভারবেরি তাঁর 'ক্যারক্টোর্স' (১৬১৪) গ্রন্থে আর-এক সঙ্কটের উল্লেখ করছেন—টেম্‌স্‌ নদীর মাঝিরা। যতক্ষণ নৌকোয় থাকে হাঁকডাকে চারিদিক উদ্বেলিত করে তোলে। ব্যবসায়ে নিশ্চয়ই মন নেই, কারণ, বড়লোক খদ্দের দেখলেই অপমান করে। আর যখন ডাঙ্গায় ওঠে তখন তো কথাই নেই; সব সময়ে খেপে থাকে—বড়লোক দেখলেই ইতরসুলভ উক্তি করে। একমাত্র থিয়েটারে গিয়ে এরা ঠাণ্ডা থাকে—মনের মিল খুঁজে পায় বোধহয়। খুব খানিকটা তুষারপাতে ব্যাটারা জমে মরে না কেন!!!!

একজন বিদেশী—ভুরটেমবের্গ-এর ডিউক ফ্রেডেরিক ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এসেছিলেন। বলছেন—ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, হামবুর্গ এবং আরো বহু রাজ্য থেকে জাহাজ আসে টেম্‌স্‌ নদী বেয়ে—ব্যবসা ফেঁপে উঠছে লণ্ডনের। কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা বড় গর্বিত, বড় দাম্ভিক। বিদেশী দেখলেই পেছনে লাগে। কিছু বলার জো নেই; তাহলেই মজুরের ভীড় জমে যাবে, মেরে বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়। জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হচ্ছে তখন; ফ্রেডেরিকের চোখে অসহ্য ঠেকলেও প্রথমটা অমন জঙ্গী হওয়া অতি-স্বাভাবিক ঐতিহাসিক সত্য।

লণ্ডনের অধিবাসীর হাতে তখন কাঁচা পয়সা জমেছে জীবনে প্রথম' সর্বোৎকৃষ্ট সরাইখানায়ও মাত্র ছ পেন্স খরচ করলে বিপুল খাদ্যসম্ভার পাওয়া যেত। উদ্বৃত্ত অর্থের একটা বড় অংশ খরচ হত তামাক কিনে, থিয়েটার দেখে এবং বেয়ার-বেইটিং—ভালুক-নির্যাতন দেখে।

বড় দাঙ্গা হত বেশ ঘন ঘন। অধিকাংশই ঘটত থিয়েটারের সামনে। কারণ এখানে অভিজাত ও সাধারণ মানুষ একসঙ্গে সমাবিষ্ট হত:এবং বারুদ ও আগুনের সমাবেশে বিস্ফোরণ হয়ই। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুনের নথিপত্রে দেখা যায়—একটি থিয়েটারের বাইরে ঘাসের উপর ঘুমিয়ে ছিল এক অ্যাপ্রেন্টিস। চার্লস গ্রোস্টক নামক এক জমিদার-পুত্র তার পেটে লাথ মারেন। ফলে মজুরটি উঠে গালি দেয়। গ্রোস্টক বলে ওঠেন—

'Prentices are but the scum of the world.

দেখতে দেখতে এ দিকে পাঁচ শ' ও দিকে পাঁচ শ' লোক দাঁড়িয়ে যায়—দাঙ্গা চলে অনেক রাত পর্যন্ত। পুলিশ এসে মজুরদের নেতাদের ধরে নিয়ে যায়। পরদিন এক বিরাট জনতা কারাগার আক্রমণ করতে উদ্যত হয়; নেহাৎ সৈন্যবাহিনী এসে পড়ায় তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। (কলকাতার মতন গুলী চলে কি-না কেরানী ফ্লিটউড লিখে যান নি!!)

আর-এক বিবরণে দেখি এক বেশ্যা নিয়ে দু জনের ঝগড়া হয় থিয়েটারের অভ্যন্তরে—একজন দর্জী, অন্য জন 'ভদ্রলোক', Gentle-man! ভদ্রলোক পলায়ন করে লায়ন্স ইন্-এ আশ্রয় নেন। লায়ন্স ইন্ অভিজাতদের মিলনকেন্দ্র—অতএব রেনল্ডস্ নামক এক মজুরের বাচ্চা চিৎকার করে তিন শ লোকের এক জনতা জড়ো করে এবং বলপূর্বক লায়ন্স ইন্-এ প্রবেশ করে, জিনিসপত্র তছনছ করে ও ভদ্রলোকদের বেদম প্রহার করে। পুলিশ এসে রেন্ল্ডস্ ও তার সঙ্গীদের শুধু নয়—থিয়েটারের মালিককেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

এরকম আরো বহু লেখায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রগতিশীল বণিক-শ্রেণী ও তাদের সমগৈক নবজাগ্রত মেহনতী মানুষ তখন সজ্ঞলব্ধ ক্ষমতা

ও অধিকারে উদ্দীপ্ত। অন্যদিকে ভগ্নমনোরথ, পচনশীল অভিজাতদের ছিল এদের প্রতি বিষম ঘৃণা। এই দুই শ্রেণীই ছিল শেক্‌স্‌পিয়ারের দর্শক। এদেরকে শেক্‌স্‌পিয়ার গভীরভাবে চিনতেন—গজদন্তমিনারে তিনি থাকেন নি। টমাস্ ফুলার স্বচক্ষে দেখেছিলেন বেন জনসন ও শেক্‌স্‌পিয়ারকে মারমেড ট্যাভার্ন নামক শুঁড়িখানায়। এত নিকটভাবে যাদের সঙ্গে মিশেছিলেন মহাকবি, তাঁদের খুশি করতেই 'হ্যামলেট' নাটক রচনা করেছিলেন।

সে যুগের থিয়েটার

হাট বসেছে—না থিয়েটার—বোঝা যাচ্ছে না! কারণ, দর্শকরা সবাই উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছেন। উপরোক্ত অ্যাপ্রেন্টিস আর মাঝি আর দোকানদাররাই হচ্ছে আসল দর্শক। দাঁড়িয়ে দেখতে হচ্ছে নাটক—সেটাই সবচেয়ে সস্তা। আর সেইজন্যেই খুব চিত্তাকর্ষক কিছু না-হলে মনোযোগ দেয়া অসম্ভব। হেন্‌ৎস্‌নের তাঁর 'ট্র্যাভেল্‌স্‌ ইন ইংলণ্ড' (১৫৯৮) গ্রন্থে বলছেন—সবাই পাইপ থেকে তোবাকার ধোঁয়া ছাড়ছে। বাদাম, আপেল প্রভৃতি বিক্রী হচ্ছে। অনেকে কিনছে ও খাচ্ছে। নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। অভিনেতা যদি একটু কাঁচা হন, বা নাটক যদি খারাপ লাগে তবে বেড়ালের ডাক ডেকে অভিনেতাকে কাঁদিয়ে ছাড়া হচ্ছে। উচ্চৈঃস্বরে আবহ সঙ্গীতের সমালোচনা করা হচ্ছে। কেউ কেউ একটু খরচ করে গ্যালারীতে বসেছে। সেখানে অন্য গণ্ডগোল; সবাই সুন্দরী মহিলার পাশে বসতে চায়, গায়ে গা ঠেকাতে চায়, মহিলার পাখা পড়ে গেলে তুলে দিয়ে চায়, মহিলার পোষাকের খুঁট ধরে প্রেমাভিনয় করতে চায়। অনেকে থিয়েটারে ঢুকেই গ্যালারিতে চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় কোথায় আছে নারী, তারপর ছোটে সেই দিকে। ও দিকে ট্র্যাজেডির অভিনয় হচ্ছে আর এ দিকে চলছে মহিলাকে অভিসারে রাজী করাবার প্রয়াস। স্টিফেন গসন তাঁর 'স্কুল অফ এবিউজ' (১৫৭৯) গ্রন্থে এই বিবরণ দিয়েছেন।

সবচেয়ে বেশি বিরক্ত করছেন অভিজাতরা। তাঁরা বসবেন মঞ্চের উপর টুল সাজিয়ে!!! দেরী করে আসবেন—। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বেদনাবিধুর মূহূর্তে হেসে উঠে প্রমাণ করবেন নিজের বৈদগ্ধ্য। অর্ধেক দেখে উঠে বেরিয়ে যাবেন। হাসিঠাট্টা করবেন নিজেদের মধ্যে, পালক দিয়ে বান্ধবীর কানে দেবেন সুড়সুড়ি। হঠাৎ সজোরে জিগ্যেস করবেন—কার নাটক হে এটা? নাটক ভালো লাগলে মাঝে মাঝে সাধারণ দর্শক এদের ওপর খেপে যেতেন— চীৎকার করতেন—'বেরিয়ে যা বোকার দল।' কিন্তু সেসব গায়ে মাখতেন না জমিদাররা।

এ হেন দর্শককে চুপ করানই এক সমস্যা ছিল। ভাল লাগানো তো একলব্যের সাধনা! হাতে উপাদান কি? শুধু কলম। কারণ গ্লোব থিয়েটার বা সোয়ানের বা কার্টেনের বা ফরচুনের আর-কিছু ছিল না। অভিনয় ছিল আবৃত্তিমূলক চীৎকার, তার উপর মেয়েদের ভূমিকায় নামত ছেলেরা। ভাবতেই পারা যায় না যে ক্লিওপেট্রা ও লেডি ম্যাকবেথ লেখা হয়েছিল ছেলেদের জন্যে!! অভিনয় হত দিনের আলোয়। অতএব আলো-আঁধারের কোনো বালাই তো নেই-ই, উপরন্তু বৃষ্টি নামলে অভিনয় স্থগিত—কারণ, মঞ্চের উপর ছাদ নেই। 'দৃশ্যসজ্জা সৃষ্টি করা যাচ্ছে না, কারণ যবনিকা নেই। তবু সৃষ্ট হল হ্যামলেট যা ঐ বিশৃঙ্খল দর্শককে চুপ করিয়ে, তাদের মন কেড়ে নিয়ে ভারাক্রান্ত চিত্তে বাড়ি ফিরতে বাধ্য করত।

হ্যামলেট-এর জনপ্রিয়তা

এইজন্যই হ্যামলেট-এর কাহিনী এত লোমহর্ষক। যে পুরোনো কাহিনী থেকে এ গৃহীত সে আরো আগের যুগের উপযোগী, আরো বীভৎস। নূতনের প্রয়োজনে তাকে সংযত করেছেন শেক্‌স্‌পিয়ার। তবু এতে কি নেই? ভূত আছে—ভূতে বিশ্বাস করত তখন অধিকাংশ মানুষ—রেজিনাল্ড স্কট-এর 'ডিসকভারী অফ উইচক্রাফ্‌ট' (১৫৮৪) দ্রষ্টব্য। বিষপ্রয়োগে গুপ্তহত্যা আছে। উন্মাদের

কার্যকলাপ আছে। পর্দার মধ্যে তলোয়ার চালিয়ে হত্যাকাণ্ড আছে। নায়িকার উন্মাদ হয়ে অশ্লীল গান গাওয়া আছে, আত্মহত্যা আছে। বিদ্রোহী জনতার রাজপ্রাসাদ আক্রমণ আছে। নায়িকার শবাধারের পাশে গোরস্থানে নায়ক ও নায়িকার ভ্রাতার মল্লযুদ্ধ আছে। তলোয়ার খেলা আছে—যা এলিজাবেথীয় দর্শকের বড় প্রিয় ছিল। তলোয়ারের ডগায় বিষপ্রয়োগে হত্যা আছে, পানীয়ে বিষ দান আছে,—এককথায় মৃতদেহের ছড়াছড়ি! ফিলিপ সিডনি কবি; তাই খেপে গিয়ে এলিজাবেথীয় নাটককে খুনোখুনির ধারাবিবরণী বলে নিন্দা করেছেন। নাট্যকার হলে সিডনি বুঝতেন—ওটা শুধু বাইরের খোলস; ওটা দরকার, নইলে দর্শক নাটক দেখবেই না!

প্রতি মুহূর্তে 'হ্যামলেটে' প্রকাশ পেয়েছে একটি দর্শক-সচেতন মন। বিশেষভাবে লক্ষণীয় কিভাবে তৎকালীন দর্শকের চেনাজানা ঘটনাকে এনে ফেলা হয়েছে নাটকের মধ্যে। একটি লাইনে, একটি ইঙ্গিতে এসে গেছে এমন একটা স্মৃতি যা দর্শকের মনে আছে সজাগ। আমাদের কাছে লাইনগুলির শুধুই নাটকীয় তাৎপর্য। সে যুগের দর্শকের কাছে সেগুলোর ছিল আরো একটা অর্থ—নাটকীয়ের উপরে দৈনন্দিনের আঁচ।

যেমন ফেব্রুয়ারী, ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা এসেক্স বিদ্রোহ করে ধৃত ও নিহত হন। সমগ্র ইংলণ্ডে নেমে আসে শোক। শেক্স্‌পিয়ারের নাট্যসম্প্রদায়ও জড়িয়ে পড়ে, কারণ বিদ্রোহের সময়ে থিয়েটারের উপর নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। তারই প্রতিধ্বনি পাচ্ছি: হ্যামলেট জিগ্যেস করছেন—এই অভিনেতারা ভ্রাম্যমান দল হয়ে গেল কি করে? শুনেছিলাম শহরে এদের খুব নামডাক! রোজেনক্রান্টস্ বলেন—

'I think their inhibition comes by the means of the late innovation,' এখানে 'inhibition' অর্থে নিষেধাজ্ঞা 'innovation' অর্থে বিদ্রোহ বা অরাজকতা, দাঙ্গা।

লেআর্টিস-এর বিদ্রোহ ও এসেক্স-এর বিদ্রোহের মধ্যে সামঞ্জস্যও

লক্ষণীয়। লেআর্টিস-এর উদ্যত অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ক্লডিয়াস বলছেন—

'There's such divinity doth hedge a king/That treason can but peep to what it would/Acts little of his will.'

আবার রোজেনক্রান্টস্-এর ভাষায়—

'The single and peculiar life is bound/With all the strength and armour of the mind/To keep itself from noyance'—ইত্যাদি।

এগুলো যে রাণী এলিজাবেথের স্বপক্ষে ঘোষণা এটা সহজেই অনুমেয়। স্মরণ রাখতে হবে এলিজাবেথ ছিলেন নূতন সমাজের পৃষ্ঠ-পোষক, দাঁড়িয়েছিলেন অভিজাতদের বিরুদ্ধে। জনতা তাঁকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত।

অসরিক চরিত্রে যে তীব্র শ্লেষে অভিজাতদের বিদ্ধ করেছিলেন শেক্স্‌পিয়ার সে যে ঘন ঘন করতালি দ্বারা সমাথত হত এটা বোঝাই যায়। তেমনি করতালি দ্বারা অভিনন্দিত হত চতুর্থ অঙ্ক; তৃতীয় দৃশ্যটি—যেখানে হ্যামলেট ফর্টিনব্রাস-এর দেশপ্রেম ও বীরত্বের স্তব করছেন, কারণ ঠিক অমনি বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন সার ফ্রান্সিস্ ভিয়ার ও তাঁর ইংরেজ ফৌজ ১৬০১ খৃষ্টাব্দে অস্টেণ্ড-এর যুদ্ধে। লোকের মুখে মুখে ফিরত সে কথা।

তেমনি বিপুল হাসি উঠত দ্বিতীয় দৃশ্যে যেখানে কথাচ্ছলে তীব্র ব্যঙ্গে জর্জরিত করা হচ্ছে সে যুগের দুই নাট্যকারের অশোভন ঝগড়াকে—বেন জনসন এবং মার্স্টন-এর ঝগড়া সে যুগে মঞ্চযুদ্ধ হিসেবে পরিচিত ছিল।

তেমনি ব্যঙ্গ আছে সে যুগের অতি-অভিনয়ের মূর্ত প্রতীক এডওয়ার্ড এলেন-এর প্রতি এবং ভাঁড়ামির রাজা উইল কেম্প-এর প্রতি। এরা সে যুগের দর্শকের অতি-পরিচিত লোক ছিলেন।

ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিতের মধ্যেও লুকিয়ে আছে এমন সমসাময়িকতা যে, চমকে উঠে হেসে ফেলতেন সে যুগের দর্শক। পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে কবর খুঁড়তে খুঁড়তে এক ভাঁড় বলল আরেক জনকে—

'Go, get thee to yaughan—

এখন এই 'ইয়হান' কথাটার মানে কি এ নিয়ে কিঞ্চিৎ গবেষণাও হল। অবশেষে পণ্ডিতরা খুঁজে বার করেছেন যে থিয়েটারের কাছে ঐ নামে একটি মদের দোকান ছিল।

সবশেষে উদ্ধৃত করা যাক্ মহাকবির আত্মসমালোচনা—নিজের দেশের সমালোচনা—দর্শকের দেশের প্রতি বিদ্রূপ। মদ্যস্রোতে ইংলণ্ড তখন ভেসে যাচ্ছে—হ্যামলেট তীব্র কশাঘাত করছেন একে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ডেনমার্কই বুঝি লক্ষ্য, কিন্তু দর্শক জানতেন কাকে উদ্দেশ করে বলা। আবার সেই গোরস্থানের দৃশ্যে আসা যাক—

Clown : It was the very day that young Hamlet was born, he that is mad, and sent into England.

Hamlet : Ay marry, why was he sent to England ?

Clown : Why, because he was mad, he shall recover his wits there, or if he do not, it's no great matter.

Hamlet : Why ?

Clown : 'Twill not be seen in him there ; there the men are as mad as he.

অনুমান করা যায় হাসিতে ফেটে পড়ত প্রেক্ষাগৃহ।

তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। মোট কথা হ্যামলেট-এর কাহিনী, ঘটনা-সংস্থাপন প্রভৃতি ছিল রোমাঞ্চকর—লাইনে লাইনে ছিল অতি-পরিচিত ঘটনার আভাস। তাবলে এতেই যদি আবদ্ধ থাকত তবে 'হ্যামলেট' কালজয়ী হত না, এও ঠিক।

'হ্যামলেট'-এর দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বই একে উন্নীত করেছে

অমরত্বের পর্যায়ে। তাবলে আবার কালোর্ধ দেশোর্ধ এক দার্শনিক নাটক যদি উপস্থিত করতে যেতেন শেক্‌স্‌পিয়ার, তাহলেও তা ধোপে টিকত না। দর্শক কর্তৃক ধিক্কৃত হয়ে অন্যান্য দু-একজন উচ্চশিক্ষিত এলিজাবেথীয় নাট্যকারের রচনার মতন সাহিত্যের ইতিহাসের কোণে টিম টিম করত ; কেউ মনেও রাখত না। বর্তমানকে লঙ্ঘন করে চিরন্তনকে ধরা যায় না—অন্তত নাটকে না। বর্তমানের হয়েই সর্বকালের হতে হবে। সহজবোধ্য মোটা-দাগে-আঁকা ঘটনা সম্ভারের জন্যেই 'হ্যামলেট' জনপ্রিয় হয়েছিল, এবং এই সহজবোধ্য খোলস ছিল বলেই দর্শকদের কেউ কেউ এর গভীরে এর জটিল অন্তঃস্থলে যেতে পেরেছিলেন।

আঙ্গিক

পরিচালক দ্বিতীয় বার যে দিন এলেন সে দিন নাট্যকার কতকগুলো প্রশ্ন শানিয়ে নিয়ে তূণে পুরে প্রস্তুত ছিলেন ; আসা মাত্র পর পর জ্যামুক্ত করতে লাগলেন তাদের। বললেন—সে দিন আপনি বলে গেলেন নাটকে যেখানে বৃষ্টি দরকার সেখানে বৃষ্টি নামান, যেখানে আগুন লাগাবার দরকার সেখানে আগুন। এ কথাগুলোর অর্থ কি? মঞ্চ-কৌশলকে কতটা পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করতে দিয়ে থাকেন? আঙ্গিককে প্রাধান্য দিলে নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না কি? বর্তমানে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে আঙ্গিক ক্রমশ বিপজ্জনক আকার ধারণ করছে এটা স্বীকার করেন কি?

বুঝলাম সেদিনকার পরাজয়ে নাট্যকার কতকটা ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। পরিচালক কিন্তু নির্বিকারচিত্তে চা-জলখাবার দাবি করলেন। কেষ্ট সব সরবরাহ করল এবং তিনি পানাহারে মত্ত হলেন। একটু পরে খেতে খেতেই বললেন—আপনার প্রশ্নগুলো দুটো বিভিন্ন মার্গের। আঙ্গিককে প্রাধান্য দেওয়া উচিত কি-না, এটা এক প্রশ্ন। আঙ্গিককে প্রাধান্য কতটা দিয়ে থাকি, সেটা আরেকটা প্রশ্ন। আমি যা করে থাকি, আগেই বলেছি, নির্লজ্জভাবেই বলেছি সেটা বক্স-অফিসের মুখ চেয়ে। যা করা উচিত, সেটা বৃহত্তর বিশ্বনাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার জাতীয় থিয়েটারের প্রশ্ন। আমি যা করি, সেটা থেকে সব সময়ে সমগ্র আমাকে খুঁজে পাবেন না। পেশাদার থিয়েটারের সীমায় আমার সমস্ত চিন্তা-জগৎকে কি করে পাবেন?

ভাষাবিদ বললেন—অর্থাৎ নিজেকে গোপন রেখে পেশাদার নাট্যশালার সেবা করতে হয়?

পরিচালক বললেন—অনেক সময়ে।

ভাষাবিদ বললেন—ভিক্তর উগোকে যেমন তাঁর উন্মত্ত আবেগপূর্ণ

কাব্য থেকে চেনা অসম্ভব। জঁা কক্‌তো বলেছেন—"ভিক্‌তর উগো, সেত্যাঁ ফু কি সে ক্রোইয়ে ভিক্‌তর উগো।" অর্থাৎ, উগো আবার কে? সে একটা পাগল যে নিজেকে উগো বলে মনে করে।

নাট্যকার গম্ভীর আদালতী কায়দায় বললেন—তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে আপনি আঙ্গিককে প্রশয় দিতে চান না, পেশাদার নাট্যশালায় দিতে বাধ্য হন?

পরিচালক চায়ে বিষম খেলেন। প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন—সেটা আবার কখন বললাম? বলেছি আমার চিন্তাজগৎকে পুরোপুরি পেশাদার থিয়েটারে খুঁজে পাবেন না।' আঙ্গিককে প্রশ্রয় না দেওয়ার প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না; উপরন্তু বলতে চাই ব্যক্তিগতভাবে আমি আঙ্গিকের সম্পূর্ণ প্রাধান্যের পক্ষপাতী। পেশাদার থিয়েটারে বরং তাকে খর্ব করে, সীমিত করে, খেলো করে রাখতে হয়; বক্স-অফিসের দাস করে রাখতে হয়। 'আমার মনের থিয়েটারে আঙ্গিকের একচ্ছত্র স্বৈরতন্ত্র।

এবার নাট্যকারের বিষম খাওয়ার পালা। অবশ্য তরল কিছু খাচ্ছিলেন না, টানছিলেন চুরুটের ধোঁয়া। সেই ধোঁয়াই অতিরিক্ত গিলে ফেলে একটু কাশলেন। সেই সুযোগে দার্শনিক বললেন—কিন্তু নাটকে কথা প্রধান। কথার চাতুর্যেই কথার ঝংকারেই পুরো দৃশ্যের আবহাওয়াটা গড়ে তোলা যায়। দুষ্মন্তের জনপথে রথ ছোটান শুধু কথার মারফত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে দর্শকের কাছে। 'মৃচ্ছকটিকে' বসন্তসেনার প্রমোদগৃহ বর্ণনার জন্যে দৃশ্যপটের দরকার হয় নি। 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যপট বা যবনিকার খোকামি সম্বন্ধে যে কঠোর উক্তি করে গেছেন জানেন নিশ্চয়ই। অত কেন? নাট্যগুরু শেক্‌স্‌পিয়ারের 'পঞ্চম হেনরি'-র সূত্রধারের প্রথম সংলাপটা স্মরণ করুন: দৃশ্যপটের ব্যাপারটা দর্শকের কল্পনার উপর ছেড়ে দিতে কি আবেগময় আহ্বানই না জানিয়েছেন মহাকবি!

পরিচালক অম্লানবদনে বললেন—তা কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, শেক্‌স-পিয়ারের মতন নাট্যকার দিন আমায়; আঙ্গিককে এক হুকুমে গৌণ করে

দেব। ওঁদের নাটকে কথার যে জাদু আছে, দিন আমাকে সে জাদু, তারপর কথা বলবেন। কাব্যের ছন্দে সব অপূর্ণতাকে যিনি ভরিয়ে রাখতে পারেন তাঁর মুখেই সাজে আঙ্গিকের সমালোচনা। বার্নাড শ পারেন নি, ইবসেন পারেন নি, চেকভ পারেন নি; পারেন নি ব্রেশ্‌ট্, টলের, এমনকি ও'নীল। পুঙ্খানুপুঙ্খ আঙ্গিক নির্দেশ রেখে গেছেন এঁরা সংলাপের পাশাপাশি। রবীন্দ্রনাথ-শেক্‌স্‌পিয়ার আর কটি মশাই? বার্নাড শ'-রা যেক্ষেত্রে পারলেন না, সেক্ষেত্রে বাংলার ঢালহীন তলোয়ার-হীন নিধিরামদের আর আঙ্গিককে আক্রমণ ক'রে কাজ নেই। আর আপনি বললেন নাটকে কথা প্রধান; এটা আমি স্বীকার করি না। দু-তিন জন মহাশক্তিশালী ক্ষণজন্মা স্বভাবকবি ছাড়া, কোনো নাট্যকার জগতে নেই যাঁর কথা প্রধান হবার যোগ্যতা রাখে।

নাট্যকার কিছু-একটা নিশ্চয়ই বলতেন, কিন্তু পরিচালক বলে চললেন বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতন—এটা আমরা প্রমাণ করব একটু পরে। প্রথমে আমাদের একটু ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হতে হবে। আঙ্গিক আকাশ থেকে পড়ে না; ভগবানও তাকে ছুঁড়ে দেন না। প্রতি দেশে প্রতি যুগে থিয়েটারের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিক-কলা গড়ে উঠছে। নাট্যকার সে আঙ্গিককে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বীকার করে নেন; সে আঙ্গিককে স্বীকার না করে উপায় নেই; সে আঙ্গিক নাট্যকারের অবচেতনকে পর্যন্ত অধিকার করে বসে আছে। শকুন্তলায় দৃশ্যপটের নির্দেশ নেই, কারণ, দৃশ্যপটের নামও কেউ শোনে নি তখন পর্যন্ত। শেক্‌স্‌পিয়ারেও সেই একই কারণে কল্পনানির্ভরতার আবেদন; কারণ, শেক্‌স্‌পিয়ারের যুগে থিয়েটারটি কি মাল ছিল জানেন তো? দিনের আলোয় অভিনয় হত; বৃষ্টি নামলে অভিনয় স্থগিত; পোশাক-আশাক সব এলিজাবেথীয় যুগেরই—মধ্যযুগের পঞ্চম হেনরি-র পোশাক যোগাড় করার উপায় নেই; ছেলেরা মেয়ের পার্ট করছে; দর্শকবৃন্দ অভদ্র; চারটি সৈনিক দেখে বুঝতে হবে হেনরি-র বিরাট বাহিনী যুদ্ধে যাচ্ছে; অভিনেতারা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছেন

আর হাত-পা ছুঁড়ছেন—এই নাকি অভিনয়। এমতাবস্থায় দর্শকের কল্পনার উপরে নির্ভর না করে উপায় কি? কিন্তু ধীরে ধীরে মঞ্চ বাক্সবন্দী হল, যবনিকার ব্যবহার এল, উইংস এল, উপরের বর্ডার এল, এল দৃশ্যপট, এল নানাবিধ যন্ত্রপাতি, আলো, ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। নাট্যকাররাও এইসবকে সাদরে গ্রহণ করলেন। এখন আর কথার উপরই নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে না; দর্শকের চোখকেও তৃপ্তি দেওয়া যাচ্ছে। নাটক প্রকৃতই দৃশ্যকাব্য হয়েছে। এখন সত্যি ঝড় বইয়ে দেওয়া যাচ্ছে মঞ্চে; অতএব ফলাও করে কোনো চরিত্রের মুখে ঝড় বর্ণনা করার দরকার নেই। এখন আস্ত একটা যুদ্ধকে মঞ্চের উপর হাজির করা যাচ্ছে; তাই নেপথ্য-যুদ্ধকে বর্ণনা করে পলাশীর আবহাওয়া ফোটাবার দরকার নেই। আমি তো বলব নাট্যকাররা এখন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন; অনেক সময়, অনেক কালি, অনেক কাগজ বেঁচে গেল, এখন সরাসরি নটকের মূল বিষয়ে প্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখন চরিত্রদের মনস্তত্ত্বের গভীরে ঢোকার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

নাট্যকার হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—প্রত্যক্ষ একটা ঘটনাকে তুলে ধরা ফিল্মের কাজ; নাটক সে ব্যাপারে ফিল্মের প্রভাবে স্বকীয়তা হারাচ্ছে। নিজস্ব ব্যাকরণ, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব ভাষা হারিয়ে সে অন্যের চর্বিতকে চর্বণ করছে।

পরিচালক বললেন—এরকম একটা ভুমর কুসংস্কার ক্রমেই দেশে ছড়িয়ে পড়ছে বটে! তবে ওটা অজ্ঞতাপ্রসূত। জমকালো দৃশ্য যে ফিল্মের অঙ্গ এটা কে বললে? যিনি বলেছেন তিনি ফিল্মের কিছু বোঝেন? আগুন-বৃষ্টি-ঝড়-যুদ্ধ-জাতীয় আঙ্গিক-আড়ম্বর চরমে উঠেছিল উনিশ শতকের মঞ্চে; তখনো ফিল্মের জন্ম হয় নি। আজ যদি সেই আঙ্গিক-ঐতিহ্য থেকে থিয়েটার শিক্ষা গ্রহণ করে তবে সেটা ফিল্মের প্রভাব হয় কি করে? আর থিয়েটারের নিজের ভাষা কি বস্তু আমার জানা নেই। কারুরই জানা নেই। এখনো সে ভাষা সৃষ্টিই হয় নি। থিয়েটার এখনো কথা, আঙ্গিক-অভিনয়, বাচিক-অভিনয়, আলোক,

মঞ্চসজ্জা ও আবহসঙ্গীত-এর জগাখিচুড়ি। এগুলোর সমন্বয়ে যে ভাষা বেরুবে সে এখনো ভবিষ্যতের জঠরে। ফিল্মের অবশ্যই নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, অপূর্ব ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাময় সে ভাষা; তবে তা জমকালো দৃশ্যচ্ছটা নয় এটা যে-কোনো রসিকই জানেন।

দার্শনিক বললেন—আপনি বললেন নাট্যকাররা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আঙ্গিককে স্বীকার করে নিচ্ছেন; এর অর্থ?

পরিচালক বললেন—যেমন ধরুন সংস্কৃত নাটকে কোথাও কোনো যবনিকার উল্লেখ নেই; কিন্তু যবনিকা অবশেষে আমাদের থিয়েটারে এল এবং তৎক্ষণাৎ নাট্যকাররা ফলাও করে নাটকে যবনিকাপাতের নির্দেশ দিতে শুরু করলেন। এখন ওটা কলমের টানেই এসে যায়, ওটাকে কেউ আর বিশেষ লক্ষ্য করেন না। কিন্তু ভুললে চলবে না, যবনিকাও আঙ্গিকের অংশ। তেমনি সতু সেন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আমদানি করতেই নাট্যকাররা সোৎসাহে বাইশ-তেইশটি করে বিভিন্ন দৃশ্য এক এক নাটকে এনে ফেললেন। এখন আর-কেউ সেটাকে আঙ্গিকের প্রাধান্য বলে ক্রন্দন করেন না। কিন্তু ভুললে চলবে না, ঘূর্ণায়মান মঞ্চও আঙ্গিকের অংশ। তেমনি এসেছে তাপস সেনের আলোকবিপ্লব; তেমনি নব্য নাট্যকাররা সেই আলোকশিল্পের সুযোগ নিতে শুরু করেছেন। প্রথমটা গোঁড়াপন্থাদের চোখে লাগছে বটে, কিন্তু অচিরে যবনিকা বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চের মতন এও স্বীকৃতি পাবে। আবার বেচারা তাপসবাবুর ওপর গোঁড়াদের যে একপেশে আক্রোশ, সেটারও কারণ খুঁজে পাই না। আঙ্গিক বলতে শুধু আলোকই বোঝায় না, পরিবেশনার সমস্ত মাধ্যমগুলোকেও বোঝায়—মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, টিমওয়ার্ক, পরিচালকের ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব; এ সবই আধুনিক আঙ্গিকের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এগুলো হয়তো বুদ্ধিহীন গোঁড়াদের চোখে পড়ে না; তাঁরা তাই তাপসবাবুকে নিয়েই পড়েছেন। আসলে পুরো যুগটা বদলে যাচ্ছে; তাপস সেন সেই পরিবর্তনে নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

নাট্যকার কিছুতেই এসব মানতে পারছেন না এটা বোঝা গেল।

প্রথমত, গলায় ঘোঁৎকার তুলে তিনি প্রতিবাদ জানালেন। তারপর বললেন—কিন্তু আঙ্গিক অলঙ্কারমাত্র। অতিরিক্ত অলঙ্কার চাপিয়ে কি নাট্যসুন্দরীর রূপ খুলবে? না, তাকে জবুড়জং জমিদারগিন্নী বানিয়ে ফেলা হবে?

পরিচালক বললেন—আঙ্গিক যে অলঙ্কার এটা আপনার ধারণা মাত্র এবং আমার মতে আপনার ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। আমি বলব আঙ্গিক-কথাটা এসেছে অঙ্গ থেকে ষ্ণিক-প্রত্যয় করে। পুরো অঙ্গটাই হচ্ছে আঙ্গিক। নাট্যসুন্দরীর পুরো দেহটাই আঙ্গিক; তার প্রাণটুকু হচ্ছে নাটকটা। দেহ বাদ দিয়ে প্রাণ হয় না। আঙ্গিক অলঙ্কার নয় যে, খুলে রেখে দেওয়া চলে। দেহটাকে খুলে রেখে, বা তলোয়ার দিয়ে দেহের এখান ওখান কেটে ফেলে প্রাণটুকুকে বাঁচাতে পারবেন না। দেহ গেলে প্রাণও গেল। প্রাণকে প্রকাশ পেতে হবে দেহের মাধ্যমে। বলতে পারেন দেহে মেদ জমতে দেওয়া উচিত নয়, বা টাক পড়তে দেওয়া উচিত নয়। দেহটাকে সুন্দর, সুষ্ঠু করে তুলতে হবে। সেটা আমি জানি। আঙ্গিককে শিল্পসম্মত করে রাখতে হবে। কিন্তু আঙ্গিক-বিরোধিতা বা আঙ্গিককে সস্তা অলঙ্কারের সঙ্গে তুলনা—ওসব নেহাত অজ্ঞতার পরিচয়। বনফুলের ভাষায় ওসব থিয়েটারের পদীপিসীদের কথা।

নাট্যকার বললেন—মানে?

ভাষাবিদ হো হো করে হেসে উঠে বললেন—'অগ্নীশ্বর' বইয়ে বনফুল এই পদীপিসী-মনোবৃত্তির উল্লেখ করেছেন।

নাট্যকার রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—সে আমার জানা আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ঐ কথাটির প্রয়োগটা বুঝতে পারলাম না।

পরিচালক কিন্তু হাসেন নি। বেশ গম্ভীর তার্কিক ভঙ্গীতে বললেন—মানে বলছিলাম একদল লোক আছেন যাঁরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। নূতনকে গ্রহণ করা এঁদের পক্ষে অসম্ভব। রেলগাড়ি যখন প্রথম চলল এঁরা বলেছিলেন ওসব শয়তানির অবসান অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যখন আকাশে

উড়ল, এঁরা বললেন ওসব নাস্তিকতার পরাজয় ঘটল বলে। তেনজিং যখন এভারেস্টে চড়লেন এঁরা বললেন ওসব বুজরুকি। গাগারিনও এঁদের মতে মিথ্যাবাদী। এখন এঁরা স্বচ্ছন্দে সেই রেলগাড়ি চড়ে কাশীধাম ঘুরে আসছেন, প্লেনেও চড়ছেন আম্লানবদনে, তেনজিং-গাগারিনকেও সবার অজান্তে মেনে নিয়ে বসে আছেন। তেমনি থিয়েটারের পদীপিসীরাও নূতন আঙ্গিকের অভ্যুত্থানে 'ধর্ম গেল' বলে রব তুলেছেন। আবার দেখবেন একদিন এঁরা নির্বিবাদে সকলের অজান্তে তাপস-খালেদদের স্বীকার করে ভবিষ্যতের তাপসদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন।

ভাষাবিদ এবং দার্শনিক দু জনেই হাসলেন উচ্চৈঃস্বরে। নাট্যকার কোন যুক্তি না দিয়ে শুধু বললেন—আই ডোণ্ট এগ্রি। তাপস সেন-খালেদ চৌধুরীরা যদি শিল্পসম্মত আঙ্গিক প্রয়োগ করতে পারতেন তবে তাঁদের নিয়ে এত গণ্ডগোল হত না। বিশেষ করে তাপস সেনের আলোকসম্পাত এত বেশি সচেতন, এত সোচ্চার, এত স্থূল যে নাটকের পরিবেশকে অতিক্রম করে সে নাটককে লঙ্ঘন করে, নাটকের বক্তব্যকে চেপে দেয়। সে চোখ ধাঁধায়।

পরিচালক বললেন—কোন নাটকে এটা ঘটেছে উদাহরণ দেবেন?

নাট্যকার সদর্পে বললেন—'সেতু', 'অঙ্গার' এবং 'ফেরারী ফৌজ' সাম্প্রতিক তিনটি নাটকেই আমি তাপসের ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করেছি। তিন-টিতেই ছেলেটা সংযমের সীমা অতিক্রম করেছে—রেলগাড়ি জল আর আগুনের খেলায় মত্ত হয়ে নাটকের বারোটা বাজিয়েছে।

পরিচালক বললেন—বারোটা বাজিয়েছে কি? গণ্ডগোলই বা ঠিক কোথায় বাধল? লোকে তো তিনটেতেই তাপস সেনের প্রশংসা করেছে। যাক, জনপ্রিয়তার ওজর আপনি মানতে রাজী নন, তাই ওসব আপনাকে বলা বৃথা। আপনি বলছেন 'সেতু', 'অঙ্গার' ও 'ফেরারী ফৌজ'-এ তাপস সেনের কলাকৌশল স্থূল হয়েছে, সোচ্চার হয়েছে। 'স্থূল' কেন বলছেন বুঝলাম না। স্থূল বলব তাকে যা উৎকট রকমের বাস্তব। একটা পাঁঠার দোকানের দৃশ্যে কেউ যদি আস্ত একটা পাঁঠা ঝুলিয়ে রাখতেন,

তাকে বলতে পারতুম স্থূল। সেতুর রেলগাড়ির দৃশ্যে যদি মডেল রেল-গাড়ি চলত তাহলে তাকে স্থূল বলা যেত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শুধু শব্দ আর আলোর প্রক্ষেপণে ট্রেন-এর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে; ট্রেনটিকে তুলে ধরা হয় নি, ট্রেনটুকুকে সাজেস্ট করা হয়েছে। সেটা স্থূল হবে কেন? অঙ্গার-এর জলও তেমনি অপূর্ব ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফেরারী ফৌজ-এর আগুনও তাই। উপরন্তু ফেরারী ফৌজ-এর আগুন পুরো নাটকের বক্তব্যকে এক চমকপ্রদ প্রতীকের সাহায্যে দর্শকের চক্ষুর সামনে উপস্থিত করেছে। নাটককে তো চেপে দেয়ই নি, বরং নাটককে বাঙ্‌ময় হতে সাহায্য করেছে। অঙ্গার-এর জল সম্বন্ধেও একই বক্তব্য। অতএব 'স্থূল' কথাটি আপনি প্রত্যাহার করতে বাধ্য।

নাট্যকার বললেন—আর 'সোচ্চার'?

পরিচালক বললেন—সোচ্চার কখনো কখনো হওয়া প্রয়োজন, নাটকেরই স্বার্থে। অভিনয় কি সব সময়ে নীচু পর্দায় বাঁধা থাকে? মাঝে মাঝে নাটকেরই প্রয়োজনে অভিনেতারা গলা তোলেন না; হাত-পা ছোঁড়েন না? দৃশ্যসজ্জায় মাঝে মাঝে নাটকেরই স্বার্থে চড়া রং ব্যবহার করা হয় না কি? পরিচালক মাঝে মাঝে অভিনয়ের গতি বাড়িয়ে দেন না? তেমনি আলোক-সম্পাতও মাঝে মাঝে সোচ্চার হতে বাধ্য, তীব্র হতে বাধ্য। আঙ্গিকের অন্য অংশগুলোর বেলায় আপনারা আপত্তি করেন না, কারণ এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আলোকসম্পাত নূতন ধারা নিয়েছে, নিজের স্থান করে নিচ্ছে; তাই আপনাদের অনভ্যস্ত চোখ টাটাচ্ছে, অন্তরস্থ পদীপিসীরা প্রতিবাদ করে উঠছে। ফেরারী ফৌজ-এর শেষ দৃশ্যে আলো কতকটা সোচ্চার হতে বাধ্য, কারণ পুরো নাটকের ক্লাইম্যাক্স ঐ আগুন। ঐ আগুন বিপ্লবীদের শেষ বিজয়, অত্যাচারীর পরাজয়। ঐ আগুন আসলে অগ্নিযুগের প্রতীক। তাই ওখানে তাপসবাবু সোচ্চার না হয়ে কি করবেন? আর নাটকের বারটা বাজাচ্ছেন তাপসবাবু—এই অভিযোগটি উল্লিখিত নাটকগুলির রচয়িতাদের কাছে থেকেই আসা উচিত ছিল; কই

তাঁরা তো এ কথা বলছেন না? তাঁদেরই নাটককে হত্যা করছেন তাপসবাবু, আর তাঁরা মনের আনন্দে তাপসবাবুর হাড়ি-কাঠে গলা বাড়াচ্ছেন? না, সেটা আমার মনে হয়, ঠিক নয়। আসলে ঐ নাট্যকাররা আধুনিক নাট্যকার। আধুনিক মঞ্চের সঙ্গে তাঁরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আধুনিক মঞ্চের কলাকৌশলকে তাঁরা আদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন; নাটকের মধ্যেই রেখে গেছেন কলাকৌশলের স্থান। তাই তাপসবাবু তাঁদের নাটকের পরিপূরক, হত্যাকারী নন।

দার্শনিক জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা আপনার মতে আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

পরিচালক জবাব দিলেন—প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিচালকের অভ্যুত্থান। পরিচালকের ক্রমবর্ধমান একনায়কত্ব। আঙ্গিককে সংহত করে সুসমঞ্জস করে মঞ্চে উপস্থাপন করেছেন এঁরা। এককালে—এই সেদিন—অর্থাৎ শিশিরবাবুর আগে পর্যন্ত পরিচালক বলে কেউ ছিলেনই না; ছিলেন মোশান-মাস্টার, যিনি কোনোমতে কথাগুলো 'বলিয়ে' নিতেন। আলোক-সম্পাত বা মঞ্চসজ্জা বা অভিনেতাদের গ্রুপিং প্রভৃতি সম্পর্কে এঁদের কোনো ধারণা বা দায়িত্বই ছিল না। আজ পরিচালকরা, অন্তত কয়েক-জন পরিচালক—সমগ্র আঙ্গিকের ওপর প্রাধান্য এবং স্বকীয়তা বিস্তার করে নাটককে ঐক্যবদ্ধ শিল্পরূপ দিচ্ছেন।

নাট্যকার একগুঁয়ের মতন বললেন—এবং সেই সঙ্গে নাটকের সর্বনাশ করছেন। যে থিয়েটারে ছিল নাট্যকারের নিরঙ্কুশ আধিপত্য; সে থিয়েটারকে এরা বারো ভূতের আস্তানা করে তুলেছেন।

পরিচালক আরো খাদ্যের আশায় কেষ্ট-র দিকে একটু দৃষ্টি হেনে বললেন—বারো ভূত কি?

নাট্যকার জবাব দেওয়া দরকার মনে করলেন না। তাই পরিচালকই বলে চললেন—নাট্যকাররা চিরকালের দাম্ভিক, পরশ্রীকাতর, স্ফীত-মস্তিক······

নাট্যকার একটা অস্ফুট গর্জন করতে পরিচালক থামলেন। তারপর শান্ত হয়ে বললেন—নাট্যকারদের আধিপত্য সত্যই খর্ব হতে চলেছে। শুধু এ দেশে নয় সারা পৃথিবীতে পরিচালকদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকাররা পিছু হটছেন। পরিচালকের জয় অর্থেই আঙ্গিকের জয়, কারণ আঙ্গিকই হল পরিচালকের আত্মপ্রকাশের ভাষা। এত দিন থিয়েটার নাট্যকারদের অধীনে ছিল একথা স্বীকার করি, কারণ এতদিন আঙ্গিক শৈশবাবস্থায় ছিল। এখন এ যুগের শ্রেষ্ঠ পরিচালক (এবং নাট্যকার) বের্টল্ট ব্রেশ্‌ট্‌ বলছেন ঃ—

"The theatre is not the servant of the dramatist, but of society."

এটাই বর্তমান পরিচালকদের জগৎ-কাঁপান রণহুঙ্কার।

দার্শনিক বললেন—স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি থেকে এ বিপ্লবের শুরু, কারণ তিনি খোদ শেক্‌স্‌পিয়ারের ওপর কলম চালিয়েছিলেন 'ওথেলো' প্রয়োজনার সময়। ওঁর 'ওথেলা' অভিনয়ের পাণ্ডুলিপিটা ছেপে বেরিয়েছে, পড়ে দেখেছি। তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যের শেষে নোট লিখেছেন ঃ

"এমিলিয়ার সঙ্গে ডেসডেমোনার অংশটুকু কেটে দিলে কেমন হয়? তাহলে ওথেলোর প্রস্থানের পর একটু নীরবতা, এবং ডেসডেমোনার হতভম্ব অবস্থা দেখিয়েই পর্দা ফেলে দেয়া যায়। সেটা আরো নাটকীয় হবে।"

এ রকম বহু জায়গায় তিনি শেক্‌স্‌পিয়ারকে এক-আধটু রদবদল করার পক্ষপাতী।

নাট্যকার ট্র্যাজিক ভঙ্গীতে বললেন—কিন্তু সেটা কি ভালো?

পরিচালক বললেন—ভালো-খারাপ বিচার করা অসম্ভব, কারণ আমরা স্তানিস্‌লাভস্কি-র 'ওথেলো' দেখি নি। প্রশ্নটা অন্যখানে। প্রশ্নটা ঝোঁকের, চিন্তাধারার। শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটককেও অনাদি-অনন্ত বলে মানতে স্তানিস্‌লাভস্কি রাজী নন। অন্য নাট্যকারদের তো কথাই নেই।

ভাষাবিদ বললেন—মেইয়েরহোল্ড ঠিক এমনি জায়গায় গোগোল-এর 'ইনস্‌পেক্টর-জেনারেল' পরিচালনার সময়ে, বারংবার নাটককে অতিক্রম

করে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন ধরুন—ডাক্তার চরিত্রটি। গোগোল-এর নাটকে এ চরিত্রের কোনো কথাই নেই। মেইয়েরহোল্ড তাকে দিয়ে অনর্গল দুর্বোধ্য জার্মান বলিয়েছেন।

দার্শনিক বললেন—আর গর্ডন ক্রেগ তো নাট্যকারকে রীতিমত একটি জগদ্দল পাথর বলে মনে করতেন। বলেছেন থিয়েটার একটি স্বতন্ত্র শিল্প;— আর নাট্যকাররা কথা ধার করেছেন সাহিত্য থেকে; ধার-করা জিনিস নিয়ে তাঁরা থিয়েটারের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করছেন। শ্রেষ্ঠ থিয়েটার হল মূকাভিনয়, পুতুলনাচ এবং ফরাসী মাইমদের আনন্দোচ্ছল হাসি। ক্রেগ বলছেন, পরিচালকরা নিজেরাই নাটক লিখতে শুরু না করলে উপায় নেই। পরিচালকরাই শুধু পারবেন কথাকে আঙ্গিকের দাস করে থিয়েটারের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে। নইলে থিয়েটার সাহিত্যের দাস হয়ে থাকবে।

ভাষাবিদ বললেন—ফরাসী থিয়েটারের অন্যতম দিকপাল গ্যাস্তঁ বাতি বলতেন, কথা-মহাশয় আমাদের সর্বনাশ করলেন; তাঁর প্রভুত্ব ঘোচাতে না পারলে থিয়েটারের মুক্তি নেই। বলছেন:

"A text cannot say everything. It can go only as far as all words can go. Beyond them begins another horizon, a zone of mystery, of silence······It is that which it is the work of the directors to express."

থিয়েটারের জগৎ কথার পরও যে জগৎ সেই জগৎকে ঘিরে। এবং সেই জগৎকে মূর্ত করে তোলবার একমাত্র উপায় খাঁটি থিয়েটারী আঙ্গিক। 'সির ল্য মো' বা 'কথা-মহাপ্রভু'র সামনে মাথা নীচু করে থাকলে জীবনে সে জগতে পৌছন যাবে না।

পরিচালক এবার উঠে দাঁড়িয়ে বিষম হাঁক ছেড়ে বললন—নূতন নাট্যশালা আর সাহিত্যের দাসত্ব করতে চাইছে না এটা আজ অবিসংবাদী সত্য। আমারও যদি উপায় থাকত তবে নূতন নাটককে নূতন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করে নূতন বাংলা থিয়েটারের জন্ম দিতাম। সে

থিয়েটার হত স্বকীয়তায় ভাস্বর ঃ পরের মুখে ঝাল খেয়ে তার দিন কাটত না। কিন্তু হায়, বক্স-অফিসের জন্যে নিজেকে সংযত করে কথার বেসাতি করে খেতে হচ্ছে। মাইকেল-ক্ষীরোদ-রবীন্দ্রনাথের যুগের থিয়েটার সত্যিই কথার দাস হয়ে ধন্য হয়েছে, কারণ ওঁরা ছিলেন কথার রাজা। বর্তমানের ডাক হচ্ছে কথাকে 'অতিক্রম করা। কারণ, আজকের রামা-শ্যামা-যত্নর কথা থিয়েটারকে শৃংখলিত করছে, বেড়ি পরাচ্ছে।

নাট্যকার পুনরায় বললেন—আই ডোণ্ট এগ্রি।

নাট্যকার—তাহলে আঙ্গিক বলতে আপনি কি বোঝেন ?

পরিচালক—আঙ্গিক বলতে বুঝি

(১) অভিনয়

(২) দৃশ্যসজ্জা

(৩) আলোকসম্পাত

(৪) আবহসংগীত

এই চারটি ক্ষেত্রেই পুরোন যুগের সঙ্গে আমাদের যুগের গরমিল। চার ক্ষেত্রেই আমরা সুদূরপ্রসারী বিপ্লব ঘটাতে বদ্ধপরিকর। পারব কি-না জানি না, তবে চেষ্টা করে যাব।

ভাষাবিদ—এক নম্বর বললেন অভিনয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে কি করতে চান আপনারা ?

পরিচালক—তার আগে বুঝতে হবে আমাদের আগের যুগে অভিনয়টা কেমন ছিল। সেটা ছিল একক অভিনয়ের গৌরবময় অধ্যায়। বিরাট বিরাট অভিনেতারা মঞ্চ কাঁপিয়ে চলে গেছেন। অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা করব সবচেয়ে শেষে, কারণ ঐটিই সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন। আজকে দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারটা নিয়ে পড়া যাক। শুধু একটা প্রশ্ন মনে রাখবেন। এই সে দিন পর্যন্ত অভিনেতাই ছিলেন থিয়েটারের মূল গায়েন। তাঁকে তুলে ধরাই ছিল দৃশ্যসজ্জার কাজ; তাঁকে সুযোগ করে দিতেই নিয়োজিত ছিল আলোক; তাঁর সঙ্গে সংগত করতেই ডাকা হত সংগতকারদের। অভিনেতার দৌরাত্ম্যে অন্য তিনটি আঙ্গিক বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অভিনেতার স্বেচ্ছাচারের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে বাংলা নাট্যসজ্জার ক্রমবিবর্তনকে।

দার্শনিক—লেবেডফ্-এর থিয়েটারে কি রকম দৃশ্যপট ছিল ?

পরিচালক—লেবেডফই বলুন আর ১৮৩৫ সালের প্রসন্ন ঠাকুরের

থিয়েটারই বলুন—দৃশ্যসজ্জা বলতে আঁকা সীন ছাড়া আর-কিছু ব্যবহারের প্রমাণ নেই। রোলার-এ জড়িয়ে সীনটাকে সড়াৎ করে ফেলে দেয়া হত অভিনেতার পেছনে। ১৮৩৫ সালের কাগজে লিখছে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় সম্বন্ধে ঃ (ব্রজেনবাবুর বই দ্রষ্টব্য)

'দৃশ্যাঙ্কন সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। চিত্রগুলির পারস্পেকটিভ মেঘ জল প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এইগুলিতে সুরুচি ও চিত্রাঙ্কনের রীতিজ্ঞান উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইল। কেবলমাত্র একটির উপরে আর একটিকে বিন্যস্ত করা ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নাই।'

অর্থাৎ একখণ্ড চট বিছিয়ে তার ওপরে মেঘ, জল প্রভৃতি এঁকে এই বিরাট পটখানাকে ঝুলিয়ে দেয়া হত অভিনেতার পেছনে। গোড়ার দিকে মনে হয় যতদূর সম্ভব চটকদার রং ব্যবহার করে দর্শকদের চোখে ধাঁধাঁ লাগাবার চেষ্টা হত। এটা যে যাত্রা নয়, থিয়েটার, এই চেতনাই যেন সদর্পে প্রকাশ পেত। নবলব্ধ স্বাতন্ত্র্যে বড় বেশি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল থিয়েটার। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীতে 'শকুন্তলা' অভিনয়ের কথা আছে, ১৮৫৭ সালের কথা।

'ছাতুবাবুর নাতি শরৎবাবু শকুন্তলা সাজিয়াছিলেন। যখন স্টেজ-এর উপরে বিশ হাজার টাকার অলংকারে মণ্ডিত হইয়া শরৎবাবু দীপ্তিময়ী শকুন্তলার রাণী-বেশ দেখাইয়াছিলেন তখন দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিলেন।'

ঐ নীরেট ধরনের আড়ম্বরস্পৃহা—বিশ হাজার টাকার গয়নার মতনই —মঞ্চকে আচ্ছন্ন করেছিল। দর্শককে চমকিত করাই ছিল উদ্দেশ্য। অথবা দর্শক পুরো ব্যাপারটাকে নূতন মনে করে আপনা থেকেই চমকিত হয়ে উঠত।

দার্শনিক—এই আঁকা-সীনের ব্যাপারটা ওঁরা শিখলেন কোত্থেকে? বাংলা যাত্রায় তো আর দৃশ্যপট নেই।

পরিচালক—না, যাত্রার সংগে আমাদের থিয়েটারের যোগাযোগটা পরোক্ষ এবং মামুলি। এ থিয়েটার বিদেশ থেকে আমদানি। সীন

আঁকার পদ্ধতিটা কলকাতার ইংরাজি থিয়েটার থেকে শেখা। ইংলণ্ডের থিয়েটারে আঁকা সীন কি করে এল সেটা আর-এক ইতিহাস; যাঁর ইচ্ছা হবে রিচার্ড সাদার্ন-লিখিত 'চেঞ্জেব্‌ল্‌ সিনারি' গ্রন্থখানা পড়ে দেখতে পারেন। কলকাতার ফিরিঙ্গি থিয়েটার ঐ ঝোলান আঁকা-সীন-এর প্রবর্তন করে। সেটাই নকল করে বাংলা থিয়েটার। এমনকি ফিরিঙ্গি শিল্পীদের ভাড়া করে এনে আঁকিয়ে নেয়াও হয়। 'হলবাইন', 'গ্যারিক' প্রভৃতি নামের উল্লেখ এই সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে।

ভাষাবিদ—একমাত্র জ্যোতি ঠাকুরের জোড়াসাঁকো থিয়েটারে এই ঝোলান সীন ছাড়াও আরো কিছুর চেষ্টা হয়েছিল; তার প্রমাণ পাই তাঁরই স্মৃতিকথা থেকে 'নব-নাটক' অভিনয় সম্বন্ধে ঃ

'দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব চেষ্টার কোনোও ত্রুটি করা হয় নাই। বন-দৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আঠা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।'

বাস্তবতা সৃষ্টির একটা প্রয়াস এখানে দেখা যাচ্ছে।

পরিচালক—অথচ একই অভিনয়ে অন্যান্য দৃশ্যে আঁকাপট ব্যবহার করেছেন ওঁরা। এতে যে সুর কেটে যাচ্ছে, প্রচণ্ড একটা বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে এটা ওঁরা বোঝেন নি।

নাট্যকার—আঁকা-সীন সম্বন্ধে আপনার আপত্তিটা কি?

পরিচালক—আমার আপত্তির প্রয়োজন নেই, মঞ্চের প্রথম বিপ্লবী আদল্‌ফ্‌ আপিয়া ঝোলান সীনের হাঁড়ি ফাটিয়ে দিয়েছেন।

ভাষাবিদ—হ্যাঁ, 'কমোঁ রেফর্মের নোত্র মিজ্‌-অঁ-সীন' প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, অভিনেতার দেহ একটা আস্ত ত্রিমাত্রিক বস্তু; পেছনে আঁকা সীনটা দ্বিমাত্রিক চিত্রমাত্র, এ দুয়ের বিরোধ মেটাবে কে?

দার্শনিক—আরো বলেছেন, স্টেজের মেজের সঙ্গে পটে আঁকা মেজে কিছুতেই মেলে না। অথচ স্টেজের মেজেটাই হচ্ছে অভিনেতার চলা-ফেরার জায়গা; সেটা মঞ্চের একটা প্রধান অংশ। তার সঙ্গে ঝগড়া

করা কুমীরের সঙ্গে কলহের মতনই ভীষণ ব্যাপার। ওর পর ঝোলান সীন আর জলে বাস করতে পারেন না।

পরিচালক—অথচ আমাদের নাট্যশালা সেই ১৮৩৫ সালের ফিরিঙ্গি থিয়েটারের নকলনবিশী থেকে আর বেরুতে পারল না। ফিরিঙ্গি থিয়েটার এগিয়ে গেল; তৎকালীন বৃটিশ থিয়েটারের প্রভাবে কলকাতার সাঁ স্যুসি প্রভৃতি রংগালয় বহুরকম মঞ্চপরীক্ষা করল, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু বাংলা থিয়েটারকে আর এগুতে অনিচ্ছুক দেখা গেল। ঐ ১৮৩৫-এর আঁকা-সীন-পদ্ধতিই একেবারে মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসল আমাদের থিয়েটারে। কেন জানেন? আমার মনে হয় এর কারণ বিরাট অভিনেতাদের আবির্ভাব। এর আগের যুগে দেখি থিয়েটারের নতুনত্বে লোক চমৎকৃত। অর্দ্ধেন্দু-গিরিশের যুগ থেকে কাগজে দেখছি অনবরত অভিনয়ের প্রশংসা; পরস্পরের তুলনা; এক জনের প্রতি আক্রমণ, আরেকজনের প্রতি অহেতুক চাটুবৃত্তি। অভিনেতারা মঞ্চ দখল করেছেন। তাই দৃশ্যসজ্জাকে উপেক্ষিত, অবহেলিত, দুয়োরানীর মতন পড়ে থাকতে হত পেছনে। অথচ আঙ্গিকের বিকাশে দুয়োরানীর অধিকারের কোনো সুয়ো-র চেয়ে কম হবার কথা নয়। কিন্তু সে অধিকার স্বীকৃত হয় নি। লোকে তখন এঁর নিমচাঁদ ভালো, না ওঁর, এঁর যোগেশ ভালো, না ওঁর—এইসব অবান্তর আলোচনায় মত্ত। মঞ্চ সজ্জাও তখন ন্যাকড়ায়-আঁকা বনপথ আর কক্ষ আর রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ থেকে ঐ অভিনেতাদের প্রতিভার আগুনে পুড়ে মরতে লাগল। আশ্চর্য ব্যাপার এখনো পর্যন্ত ঐ একক অভিনেতার অসংযত আস্ফালন চলছে। তাই এখনো থেকে থেকে নোংরা ঝোলানো সীন ব্যবহার হয়েই চলেছে।

নাট্যকার—আঁকা-সীন-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কি হয় নি আমাদের থিয়েটারে? তবে ফ্ল্যাটের ব্যবহার এল কি করে?

পরিচালক—বিদ্রোহ হয়েছে, সত্যি কথা। কাঠের-খাঁজে আঁকা ফ্ল্যাট ঠেলে দেওয়া হয়েছে মঞ্চের উপর। কাট-আউট ব্যবহার হয়েছে।

ঝোলান সীনের গায়ে ফুটিয়ে দেয়া হয়েছে দরজা-জানালা। ছোট-খাট বেদী ও সিঁড়ির ব্যবহার হয়েছে। অবশেষে সতুবাবুর হস্তক্ষেপে ঘূর্ণায়মান মঞ্চও এসেছে। কিন্তু এর একটিও আঁকা সীনকে হটাতে পারে নি মঞ্চ থেকে। এর একটিও সত্যিকারের শিল্পসম্মত দৃশ্যসজ্জা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। অভিনেতার গগনস্পর্শী দম্ভের পায়ে তাদের চুরমার হতে হয়েছে! অভিনেতাকে মঞ্চটা ছেড়ে দিয়ে এরা সবাই ভিড় করেছে পেছনের দিকে, ধুকপুক করে কোনো মতে বাঁচবার জন্যে।

ভাষাবিদ—সেইজন্যেই এই সে দিনও কি সব বীভৎস কুৎসিত সীনই না দেখতাম আমরা। মনে আছে 'বঙ্গে বর্গী'তে লুণ্ঠিত গ্রাম এঁকে দেয়া হয়েছিল। জ্বলন্ত আগুন স্থির হয়ে আছে পেছনে; অমন অনড়, প্রস্তরীভূত শিখা জীবনে দেখি নি। আর সামনে গাদা গাদা আঁকা মৃতদেহ।

নাট্যকার—একটি হ্রদের দৃশ্যপটে আকাশে উড়ন্ত পাখী আঁকা দেখেছি। সে পাখী যে অচল ত্রিশংকু হয়ে আছে শিল্পীর চোখে তা পড়ে নি।

পরিচালক—'চিরন্তনী' নামে একটি নাটকে হাসপাতালের দৃশ্যে সারি সারি বিছানা মায় রুগীদের পর্যন্ত এঁকে দেয়া হয়েছিল। একটা ঘড়ি ছিল দেয়ালে, তাতে বারোটা বেজে গেছে; আর বাজবে না। পাখা আছে মাথার উপরে, জীবনে ঘুরবে না। স্টেথিস্‌কোপশুদ্ধু এক ডাক্তারকে যে কেন এঁকে দেয়া হয় নি বুঝলাম না।

দার্শনিক—আচ্ছা, ঐসব দৃশ্যপটগুলোকে প্রতীক বলে ধরে নিতে আপত্তি কি? বাস্তবতা খুঁজেছেন কেন? বাস্তবের ইঙ্গিতমাত্র বুঝে নিন না।

পরিচালক—আঁকার স্থূল পদ্ধতিটা দেখলেই বুঝবেন শিল্পী মোটেই ইঙ্গিত দেন নি, প্রাণপণে বাস্তবটাকে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে ওঁর স্থূল রসবোধে ওর চেয়ে ভালো কিছু খেলে নি। পটুয়াদের মধ্যে ক জন সত্যিকারের শিল্পী থিয়েটারে এসেছেন?

ভাষাবিদ—আর ইঙ্গিত ওরকম রুগী-টুগী এঁকে হয় না; শুধু যদি একটি খাট থাকত তো হাসপাতাল বলে মেনে নিতাম; শুধু যদি ন্যাড়া গাছ একটা থাকত তো বর্গী-বিধ্বস্ত গ্রামের প্রতীক হিসেবে মেনে নিতে পারতাম। ইঙ্গিত বা প্রতীক কম-কথার জিনিস; এত বেশি বললে আর প্রতীক-ট্রতীক থাকে না; ও হল স্থূলতম শিল্পবোধের পরিচয়।

পরিচালক—থিয়েটারের প্রতীক থিয়েটারের নিজস্ব কায়দায় হবে এবং সেটা নব-নাট্য আন্দোলনের কর্মীরাই করবেন। এখনো তার লক্ষণ স্পষ্ট হয় নি, তবে হবে।

নাট্যকার—ঐ নিজস্ব কায়দাটা বুঝলাম না।

পরিচালক—চিত্রকলার প্রতীকগুলো যেমন চিত্রকলার মাধ্যমেই আসছে; থিয়েটারের ইঙ্গিতগুলোও তেমনি বলিষ্ঠ থিয়েটারী ঢং-এই হবে। ন্যাড়া গাছকে যুদ্ধের প্রতীক করাটা চিত্রকলার কায়দা; শকুনের ডানা ঝটপট দেখিয়ে আকালের চেহারা আনাটা চলচ্চিত্রের কায়দা হতে পারে; একটি গমক তানে 'পবন চলত শননন' গানের মূল কথাটা পরিস্ফুট করা যেতে পারে। ঠিক তেমনি আঁকা সীন, বা ফ্ল্যাট বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চের দৌরাত্ম্য কাটালে থিয়েটারের দৃশ্যসজ্জাও তেমনি নিজস্ব থিয়েটারী ইংগিতে কথা কইবে।

নাট্যকার—যথা? আপনার হাতে থিয়েটার পেলে কি করবেন?

পরিচালক—থিয়েটার এবং দর্শক পেলেই আমি যবনিকা বাদ দেব। তারপর বাদ দেব উইংস্, বর্ডার, প্রভৃতি। তারপর হটাব সীন-জাতীয় যত জিনিস। মেজেটাকে নানা আকারের বেদী দিয়ে ভরে দেব; এলোমেলো এদিকে ওদিকে সিঁড়ি সাজাব। অভিনেতা চলতে গেলেই যাতে সিঁড়ি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। উচ্চতর বেদী ব্যবহার করে মেজে আর ব্যাটেন লাইটের মধ্যবর্তী বিশাল জায়গাটা ব্যবহার করব। ঝড় বোঝাতে ব্যবহার করবো ক্রেগ-এর আঁকা রেখা-কাটা একটা কালো পর্দা বা ব্রেশ্‌ট্-বর্ণিত বিদ্যুৎ আঁকা একটা ধূসর পর্দা। জল বোঝাতে ব্যবহার করব নীল পোষাক পরা জনা কুড়ি নর্তকী। আগুন

বোঝাতে হয়তো উদয়শংকরের প্রদর্শিত কিছু লাল রিবন নাড়ব। বৃষ্টি বোঝাতে গুটি দশেক ছাতা খুলে ধরব। যুদ্ধক্ষেত্র বোঝাতে পর্দা আর বেদীগুলোকে নাড়াব ভীম বেগে। মাতালের চোখে কলকাতা দেখাব ঃ কার্ডবোর্ডের মনুমেণ্ট আর হাইকোর্টকে চাকায় বসিয়ে ছুটিয়ে দেব মঞ্চের উপর দিয়ে, এলোমেলো ডগমগ কলকাতা—। যাক্ করব অনেক কিছুই। কিন্তু যা করব তা থিয়েটারী ঢং-এই করব। চিত্রপটের খোকা-সুলভ বাস্তবতা আমদানি করব না। অন্য শিল্প থেকে ধার করে করব না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। অভিনেতাদের অত্যাচারে মঞ্চের যখন নাভিশ্বাস উঠেছে, ছেঁড়া ময়লা সীন আর বিবর্ণ হলদে আলো আর কার্বন আর্ক-ল্যাম্পের মূর্খ জগতে যখন অভিনেতারা পরস্পরকে প্যাঁচ মেরে আত্মসন্তুষ্ট, তখন দৃশ্যসজ্জার প্রথম আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করলেন গণনাট্য সঙ্ঘ। তাঁরা এই সীনের খোকামি ছাঁটাই করে স্রেফ একটি চটের পর্দার সামনে অভিনয় শুরু করলেন। ঐ নোংরা সীনের জগতের তুলনায় এ যে ঢের বেশি শিল্পসম্মত তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু দৃশ্যসজ্জার দিক থেকে বক্তব্য থেকে যায়। কি জন্যে ওঁরা একরঙা পর্দাকে দৃশ্য হিসাবে ব্যবহার করলেন তার দুটো ব্যাখ্যা দেয়া যায় ঃ

(১) ওঁরা জনতার কাছে নাটক পৌঁছে দেয়ার ব্রত নিয়েছিলেন। হাতে নাট্যশালা ছিল না, বা থাকলেও তাঁরা নিতেন না। অল্প খরচে অত্যন্ত সচল অভিনয় দল গঠনের অঙ্গ হিসেবে হালকা দৃশ্যপট সৃষ্টি করেছিলেন। একরঙা চটের পর্দা নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়া সম্ভব।

(২) তাঁরা সচেতনভাবে মঞ্চের নোংরামি ত্যাগ করার জন্যে সীন-আদি বাদ দিয়ে একরঙা পর্দার প্রচলন করেছিলেন।

গণনাট্য সৃষ্টির ব্যাপারে ওদেঁর মহান ভূমিকা স্বীকার করেও বলবো এ দুটো ব্যাখ্যার কোনোটাই আমার কাছে সন্তোষজনক নয়। অত্যন্ত অল্প খরচে অত্যন্ত হালকা রেখেও দৃশ্যসজ্জা সৃষ্টি করা যায়। একরঙা পর্দার সামনে অভিনয় করলে অভিনয় আর আবৃত্তির মধ্যে তফাত রইল

কি? মঞ্চের কলাকৌশল জানা থাকলে 'অংগার' নাটক নিয়েও অবলীলাক্রমে সারা ভারত সফর করা যায়। তার জন্যে মঞ্চের চেহারাটিকে বিকৃত করার প্রয়োজন নেই। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির তাৎপর্য হল মঞ্চের বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে মঞ্চের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বসা। ঐতিহ্যকে একেবারে নাকচ করলে কিসের উপর দাঁড়াবো? আরো লক্ষণীয়—অভিনেতার আধিপত্য কিন্তু পরোক্ষে স্বীকার করেই নেয়া হল। মঞ্চসজ্জা অনাদৃত ছিল, এখন একেবারেই পরিত্যক্ত হল। আগে অভিনেতা সর্বপ্রধান ছিলেন, এখন অভিনেতা একমাত্র গায়েন হয়ে উঠলেন। সারা মঞ্চে অভিনেতা ছাড়া আর কেউ নেই। আমি বলব মহান গণনাট্য সংঘ এ ব্যাপারে ভুল করেছেন। পুরোনো রঙ্গমঞ্চকে মুক্ত করতে গিয়ে সে মঞ্চের শিকলে নিজেরাই বাঁধা পড়েছেন। না, এ পথে বাংলার নাট্যশালা সংস্কার হবে না। দৃশ্যসজ্জাকে বাদ দেয়ার প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না। বরং তাকে উন্নত, শক্তিশালী করে অভিনেতার সমান পর্যায়ে তুলে আনতে হবে। মঞ্চের ঠাট বজায় রেখেই মঞ্চকে এগিয়ে নিতে হবে, মঞ্চকে অস্বীকার ক'রে নয়।

নাট্যকার—তাহলে বর্তমান নবনাট্য আন্দোলন দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারে কি করছে?

পরিচালক—বর্তমানে তারা সীন আর ঘূর্ণায়মান মঞ্চের কব্জা ভাঙছে। সীনের দৌরাত্ম্যের কথা আগেই বলেছি। আর ঘূর্ণায়মান মঞ্চের কথা বলার প্রয়োজন নেই। আপনারা জানেন দু মিনিটের বেশি একটা দৃশ্য স্থায়ী হচ্ছে না, তার আগেই মঞ্চ ঘুরে যাচ্ছে, আর রঙীন রঙীন সব সীন বেরুচ্ছে। একটা নাটকে বাইশটা দৃশ্য! ভাবতে পারেন? কলকাতার পেশাদার নাট্যশালার কাছে ঘূর্ণায়মান মঞ্চটা শিশুর হাতে খেলনার মতন; ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে দেখে তার অপক্ক আশ আর মেটে না। নবনাট্য আন্দোলন ওসব ছাঁটাই করে সলিড, আস্ত সেট্ প্রবর্তন করছে: ঘরবাড়ি, নদীর বাঁধ সব আস্ত ত্রিমাত্রিক রূপে

তুলে ধরছে। 'রূপকার', 'শিল্পিমন', 'গন্ধর্ব' এবং 'দশরূপক' সম্প্রদায়গুলির সাম্প্রতিক নাটকগুলি লক্ষ্য করলেই দেখবেন এদ্দিনে বোধহয় ঠিক পথে এগুতে শুরু করেছি। এখানে ছেঁড়া সীনও নেই, আবার একরঙা পর্দাও নেই। সত্যিকারের দৃশ্যসজ্জার গোড়াপত্তন হচ্ছে। অবশ্যই 'বহুরূপী' এবং 'লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ' এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। কিন্তু ধারাটা ছড়িয়ে পড়ছে এটাই সবচেয়ে আশার কথা। কারণ এ না হলে আধুনিক নাট্যকারদের নাটক অভিনয় হবে কি করে?

নাট্যকার—অর্থাৎ?

পরিচালক—আগেকার নাট্যকাররা অভিনেতা-কেন্দ্রিক মঞ্চের জন্যে লিখে গেছেন। তাই দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারে তাঁদের কোনো নির্দেশ থাকত না। শুধুমাত্র কোথায় ঘটনা ঘটছে তার একটা ইংগিত দিয়েই সংলাপে চলে যেতেন তাঁরা। যেমন 'নীলদর্পণ'। দৃশ্যের কি নির্দেশ দিচ্ছেন দীনবন্ধু? 'গোলকচন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক', 'সাধুচরণের বাড়ি', 'বেগুণবেড়ের কুঠি', 'গোলোক বসুর দরদালান' ইত্যাদি। ঐটুকুই। আর-কিছু নয়। কিন্তু ইওরোপে যে দিন আর্ভিং-কেম্ব্‌ল্‌দের আধিপত্য ঘুচতে শুরু করল, সে দিন থেকে নাট্যকাররা আশ্চর্য সব নির্দেশ দিতে শুরু করলেন। ইবসেনের নির্দেশগুলো দেখুন; পাতার পর পাতা লিখে গেছেন। 'গোস্ট্‌স্' নাটকের শেষে সূর্যোদয়ের নির্দেশটা মনে আছে? বার্নার্ড শ'-র যে-কোনো নাটকের নির্দেশ দেখুন; 'জানলা দিয়ে পাহাড়ের তুষার দেখা যাবে' (আর্মস্ এণ্ড দি ম্যান) বা 'ঝমঝম করে গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টি পড়ছে' (পিগমেলিয়ন) এসব তো আছেই। মায় আসবাবপত্র কোন্ নাটকের কি ধাঁচের হবে তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ আছে। আর্চার-এর 'গ্রীন গডেস্' নাটকের গোড়ায় একটি ভূপাতিত এরোপ্লেন দেখাবার নির্দেশ আছে; নাটকের শেষে মঞ্চে বোমাবর্ষণের নির্দেশ আছে। গোর্কির 'লোয়ার ডেপথ্‌স্'-এ দেয়ালে কতটা রং উঠে গেছে তারও বর্ণনা আছে। আরো পরের যুগে আমেরিকার কিংসলি-র 'ডেড এণ্ড' নাটকে একটি বস্তীর মাঝখানে একটি

ডোবা থাকার নির্দেশ আছে ; নাটকের নায়করা, অর্থাৎ বস্তীর ছোকরারা সেই ডোবায় চান করছে আর সংলাপ বলছে। পেছনে নদী থাকবে ; নাটকের মাঝখানে সেই নদী দিয়ে একটি আলোয় আলোকিত জাহাজ চলে যাবে। রুশ নাট্যকার কর্নেইচুক-এর 'ফ্রন্ট' নাটকে ট্যাংক চালাবার কথা আছে। তেমনি দেখুন আধুনিক বাঙালি নাট্যকাররাও বিচিত্র সব নির্দেশ দিচ্ছেন ; বিচিত্র সব জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছেন দর্শককে। অঙ্গারের শেষ দৃশ্যে খনির তলায় গহ্বরের অভ্যন্তর দেখাবার নির্দেশ আছে। কোনো আঁকা-সীনে সে পরিবেশ ফুটতে পারে কখনো ? কোনো একরঙা পর্দায়ই কি ফুটবে তা ? দিগিনবাবুর 'তরঙ্গ' নাটকের একটি নির্দেশ—

'বালুচর। শেষ রাত্রি, ঘন অন্ধকার। দূরে আর-একটা চরের বাড়িগুলো কালো রেখার মতো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নদীর ধারে কাশবন। কাশবনের মধ্য দিয়ে নদী থেকে পারে উঠবার একটা আঁকাবাঁকা পথ। ছায়ার মতো কতকগুলো লোক বসে।'

বলুন আমায়—কোনো আঁকা পটে এ পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে ? বিজন ভট্টাচার্যের নাটকেও এই ধরনের নির্দেশের ছড়াছড়ি। নূতন নাট্যকাররা আরো দুর্জয় পরীক্ষা চালাচ্ছেন, আরো কঠিন জিনিস আনতে বলছেন মঞ্চে। দিলীপ রায় 'একটি নায়ক' কাব্যনাট্যে কি নির্দেশ দিচ্ছেন শুনুন—

'একটি বে-ওয়ারিশ মৃতদেহ টেবিলের ওপর রাখা হয়েছিল। সারাদিন সে উপেক্ষিত অবস্থায় গবাক্ষ থেকে পালিয়ে-আসা বৃষ্টির ছাট, রৌদ্রের তাপ সহ্য করেও নির্বিকার পড়ে রইল ; কিন্তু রাত্রের অন্ধকারের গভীরতায় কেউ কোথাও নেই দেখে সে ধীরে ধীরে উঠে বসল।'

এখানে শুধু পরিবেশ নয় ; ঐ বৃষ্টির ছাট আর রৌদ্রের তাপের মধ্যে ফুটে উঠবে অবহেলিত মানবতার বেদনা। নাটকের নায়কের বেদনাটাকে মূর্ত করতে চাইছেন কতকগুলি দৃশ্যমান জিনিসের সাহায্যে। কোনো কথা বলার আগে দ্রুত দেখাতে হবে একটি ছুটির দিনের হিসাব কয়েক

মিনিটের মধ্যে—একটি দিনের বৃষ্টি আর রোদ, একটি দিনের লাঞ্ছনা। তেমনি দেখুন অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নচিকেতা' র একটি নির্দেশ—

'সম্মুখে সমতল প্রান্তর। পিছনে পথ; বক্ররেখাকারে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। রাত্রির আকাশ। আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের কিছু উপরে শিংশুমার। এগারোটি নক্ষত্রে শিংশুমার মৎস্যাকারে অবস্থিত। প্রথম সারিতে দুইটি, দ্বিতীয়ে তিনটি, চতুর্থে দুইটি, তাহার পর প্রত্যেক সারিতে এক-একটি করিয়া চারটি। দ্বিতীয় সারির মধ্যমটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। ইনিই যম।'

মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ ঐ রকমই হবে আধুনিক নাট্যকারদের নির্দেশ। এটা স্টান্ট নয়; 'নচিকেতা' পড়া থাকলে জানতেন ঐ নক্ষত্র, বিশেষত যমের সঙ্গে নাটকের কি গভীর সম্পর্ক। আধুনিক দৃশ্যসজ্জা যদি এটাকে ধরতে না পারে, যদি বাদ দিয়ে একরঙা পর্দার আশ্রয় নেয়, তবে আমার মতে তা এ নাটকের ক্ষতি করবে। নতুন দৃশ্যসজ্জা নাট্যকারদের কলম খুলে দেবে। ইচ্ছামত পরীক্ষা তাঁরা চালাতে পারবেন। স্টেজে দেখাবো কি করে?—এ আর্তনাদ বিগত যুগের আর্তনাদ। বর্তমান মঞ্চে অসম্ভব বলে কিছুই থাকবে না।

আলো

[প্রচুর চা-সিঙাড়ার সদ্ব্যবহার করে পরিচালক আবার বক্তৃতা দিতে উঠলেন।]

পরিচালক—নতুন আলোকসম্পাত কোন্ পথে যাওয়ার চেষ্টা করছে তা বুঝতে গেলে আবার সেই পুরনো কাসুন্দি না ঘেঁটে উপায় নেই অর্থাৎ এই সে দিন পর্যন্ত আমাদের নাট্যশালায় আলোকসম্পাতের কি হাল হয়েছিল সেটা বুঝতে হবে। দেখুন, বাংলা নাট্যশালা মহাশক্তিশালী নাট্যকারের জন্ম দিয়েছে। কয়েকজন প্রতিভাবান অভিনেতাকেও তুলে ধরেছে, কিন্তু মঞ্চ-কলাকৌশলের ক্ষেত্রে বাংলা নাট্যশালা গত একশ বছরে কিস্যু করে নি—একেবারে শূন্য, রিক্ত, দেউলে। এটা স্বীকার করতে কষ্ট হয়, কিন্তু স্বীকার করতে হবে, নইলে আত্মসন্তুষ্টিও কাটবে না, নবনাট্য আন্দোলনকেও বুঝতে পারব না ভবিষ্যতের দিকে পা ফেলতেও পারব না। এবং এই দেউলিয়াপনার মূল কারণ আমরা বলেছি দাম্ভিক অসংযত অতি-অভিনেতাদের দল, যাঁরা নাটকের মধ্যমণি হয়ে থাকার প্রলোভনে এবং নিজেদের দুর্বলতায় ভীত হয়ে মঞ্চের অন্যান্য বিভাগগুলোকে পঙ্গু করে রেখেছিলেন।

দার্শনিক—সে তো আপনি দৃশ্যসজ্জার আলোচনায় বলেছেন।

পরিচালক—বারবার বলার প্রয়োজন আছে, কারণ জাত্যাভিমানে আমরা বাংলা থিয়েটার সম্বন্ধে গর্বান্ধ হয়ে অজস্র অত্যুক্তি করে থাকি। আজ বাংলার রঙ্গমঞ্চকে সঠিকভাবে যাচাই করার দরকার আছে। আগেই বলেছি অভিনেতাকে বড় করতে দৃশ্যসজ্জাকে আঁকা সীনে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল। আলোকসম্পাত আবার দৃশ্যসজ্জার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই আঁকা সীন যেখানে প্রধান দৃশ্যপট সেখানে আলোর উন্নতির পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে থাকবে এটা সহজেই বোঝা যায়।

নাট্যকার—কেন ?

পরিচালক—আঁকা সীন অর্থই হচ্ছে পুরো মঞ্চ জুড়ে একটা দ্বিমাত্রিক চিত্রপট। আলোর সেখানে একমাত্র কাজ পটটাকে দৃশ্যমান করে রাখা, আলোকিত করে রাখা। যদি একটা ছায়ার দরকার হয় তবে সীনে ছায়াটা এঁকেই দিতে হবে, আলোকের সাহায্যে ছবির ওপর ছায়া ফেললে তো চলবে না। রাতের দৃশ্য এঁকেই বোঝাতে হবে, রাতের স্বল্প চন্দ্রালোক যদি আলো দিয়ে বোঝাতে যান তো পেছনের সীনটা অদৃশ্য হয়ে যাবে! একটা নাটক দেখেছিলাম—'হায়দ্রাবাদ'। রাত্রের নগরীর দৃশ্য বোঝাবার জন্যে পটুয়া চাঁদ এঁকেছেন, নীলাভ বাড়ি এঁকেছেন, বাড়িগুলোর অসংখ্য আলোকিত জানলা এঁকেছেন। সেখানে আলোর কর্তব্য কি? সমান উজ্জ্বল আলোকে পুরো পটটাকে উদ্ভাসিত করে রাখা। আলোও যদি স্বধর্ম পালনে ব্রতী হয়ে রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি করার চেষ্টা করত তবে পটুয়ার এত পরিশ্রম বিফল হত, দৃশ্যপটটা দেখাই যেত না। 'ঝিন্দের বন্দী' দেখেছেন? এই সে দিন হয়ে গেল 'মিনার্ভায়'। উদিতের বাগানবাড়ির সামনে এক প্রকাণ্ড ছায়া পড়েছে প্রাসাদের; ছায়াটা আঁকা; সে ছায়াসৃষ্টিতে আলোর কোনো অংশ থাকতে পারে না; আলোটাকে উজ্জ্বল রেখে আঁকা ছায়াটাকে দৃশ্যমান করাই আলোকশিল্পীর একমাত্র কাজ এখানে। ঠিক তাই হয়েছিল আমাদের থিয়েটারে; এই সে দিন পর্যন্ত তাই ছিল, এখনো অনেক জায়গায় তাই আছে। এই নিখাদ নির্ভেজাল তাঁবেদার আলোকসম্পাত কি দিয়ে করা হয়ে এসেছে?—পায়ের কাছে একসারি ফুটলাইট; আর মাথার উপরে কয়েক সারি ওপেন-ট্রাও ব্যাটেন, সাদা থিয়েটারি বাংলায় যার নাম ঝরি। এছাড়া কতকগুলো বড় ফ্লাড খাড়া করে সাজিয়ে একজোড়া টরমেণ্টর ব্যাটেন। তাও বৃহৎ ওলিভেট্ ফ্লাড নামক বস্তুটিও এঁরা কোনো দিন ব্যবহার করার কথা ভাবেন নি। এইসমস্ত অসংযত চুনকাম-করা আলোর ফল কি জানেন? পুরো মঞ্চটাকে সমানভাবে আলোকিত করার কি ফল? প্রথমত, দৃশ্যপটটাকে একটা নোংরা ন্যাকড়ার মতন দেখাতো; দ্বিতীয়ত, মঞ্চের কোনো-একটা

অংশকে গুরুত্ব দেবার প্রশ্নই উঠত না, তৃতীয়ত, আবহাওয়া-সৃষ্টি জিনিসটি একেবারেই অসম্ভব ; চতুর্থত, উজ্জ্বল দৃশ্যপটের সামনে অভিনেতাকে আলাদা করে তুলে ধরতে অতিরিক্ত কড়া আর্ক-লাইট দরকার হত। আর ঐ আর্ক-ল্যাম্পেরই বা কি ব্যবহার আমরা দেখেছি ? অভিনেতা-হুজুরের চোখ-পাকানো আর দাঁত কিড়মিড়ের মূহূর্তে একটা 'ফোকাশ' মেরে মুখখানাকে উজিয়ে দেয়া ছাড়া স্পট-লাইটের ব্যবহার আমরা কোথায় দেখেছি ? তাপস সেনের আগে স্পট-লাইটের প্রকৃত ব্যবহার দেখি নি—এ কথাটা স্বীকার করতে হবে। স্বীকার করতে কারো কারো বুক ভেঙে যাবে জানি, তবু করতে হবে।

নাট্যকার—কিন্তু আপনার কথাটা বুঝতে পারছি না। পুরনো দিনের আলোর চেয়ে তাপসবাবুর আলো তো উন্নত হবেই ; তাতে কি প্রমাণ হল ? 'আলালের ঘরে দুলাল' থেকে নজীর দেখিয়ে এখন যদি কেউ প্রমাণ করতে বসেন যে বনফুল অনেক উন্নত তাতে কি 'আলালের ঘরে দুলালের' কৃতিত্ব কমে ? তাতে কি নতুন কিছু আমরা জানতে পাচ্ছি ?

পরিচালক—আপনার উপমা ঠিক হল না। 'আলালের ঘরে দুলাল' অনেক দিন আগেই সিংহাসনচ্যুত হয়ে গেছে ; বঙ্কিমবাবুরা সে ধারাকে অনেক পুষ্ট, অনেক বেগবতী করে বিশ শতকের হাতে তুলে দিয়েছেন। বিশ শতকে রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রোত্তররা সে ধারাকে যথাযথ বইয়ে নিয়ে গেছেন সামনের দিকে। থিয়েটারে তা হয় নি। 'আলালের ঘরে দুলাল' থিয়েটারে জগদ্দল পাথরের মতন চেপে বসেছিল এই সেদিন পর্যন্ত, এখনো কতক কতক আছে। এবং একদল লোক এখনো চীৎকার করে বলেন, ঐ আলালী আলোই আসল থিয়েটার ; তাপস সেন যা করছে সব বাজে। সেইজন্যেই থিয়েটারের 'আলাল' নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। সাহিত্যে 'আলাল' একটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্বীকৃত ; থিয়েটারের 'আলাল' কিন্তু একটি কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে, থিয়েটারের বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে। তাই একে উচ্ছেদ করা প্রয়োজন।

নাট্যকার—কিন্তু তাপসবাবু পুরনো আলোকসম্পাতকে ভেঙ্গে কি গড়ছেন ? নিছক বাস্তবতা ! যেমন 'অঙ্গারের' জল বা 'ফেরারী ফৌজের' আগুন ! বাস্তবতা কি শিল্প ? বাস্তবানুকরণই কি থিয়েটারের উদ্দেশ্য ?

পরিচালক—নিশ্চয়ই না ! সত্যিকারের থিয়েটারে বাস্তবতার স্থান নেই। কিন্তু বর্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চে ঐ বাস্তবতাই প্রয়োজন। এতদিন বাংলা রঙ্গমঞ্চে ছিল হরি ঘোষের গোয়াল। তাকে বাস্তবোত্তর শিল্পে নিয়ে যেতে হলে আগে নিছক বাস্তবতাই কিছুদিন গড়তে হবে। যে শিশু দাঁড়াতে শেখে নি তাকে গোড়াতেই একশ মিটার দৌড়ে নাম লেখাতে দেয়া কি উচিত ? তাপসবাবুরা বাংলা নাট্যশালার আঙ্গিককে দাঁড়াতে ও হাঁটতে শেখাচ্ছেন। ভবিষ্যতের রেকর্ড-ভাঙ্গা দৌড়ের গোড়াপত্তন করছেন। গত একুশ বছর শিশু যে শুধুই মাটিতে পড়ে কেঁদেছে আর আঙুল চুষেছে।

ভাষাবিদ—তাপসবাবুর আলোকসম্পাতের মূল নীতিগুলো কি ?

পরিচালক—সেটা অবশ্যই তাপসবাবু ছাড়া আর-কেউ বলতে পারবেন না। তবে তাঁর কাজ দেখে আমরা একটা অনুমান করতে পারি নিশ্চয়ই। কথাটা আমাকে ইংরিজিতে বলতে দেবেন দয়া করে ?

ভাষাবিদ—কেন ?

পরিচালক—কারণ বাংলা পরিভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

নাট্যকার—বেশ, বলুন।

পরিচালক—তাপসবাবুর আলো is more than a medium of visibility. It affects the appearance of all elements of the stage and by this power becomes a determining element in the composition of a stage picture. শুধুমাত্র মঞ্চটাকে দৃশ্যমান করার মধ্যেই তাপস সেনের আলো আবদ্ধ নেই। মঞ্চের প্রত্যেকটি বস্তু, প্রত্যেকটি মানুষকে আলোর স্পর্শে একটা অন্য চেহারা দেন তাপসবাবু। সেই খণ্ড খণ্ড চেহারা থেকে সমগ্র

নাটকটার একটা ঐক্যবদ্ধ চেহারা গড়ে ওঠে। আধুনিক থিয়েটারের আলো সর্বসময়ে নাটকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা কয়। এ ধরনের আলোর জন্যে স্বভাবতই পুরনো আঁকা সীন একেবারে অনুপযুক্ত। এখন দরকার ত্রিমাত্রিক সজ্জা, আস্ত ত্রিমাত্রিক জিনিস যার উপরে আলো খেলতে পারে, বা আলো নিতে পারে। দরকার আস্ত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা-বিশিষ্ট সলিড বেদী, সিঁড়ি ; দরকার কালো বা ধূসর পশ্চাৎপট যা উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করবে না, অর্থাৎ আলোক-পরিকল্পনাকে বিচ্ছুরিত আলোয় ছত্রভঙ্গ করবে না।

দার্শনিক—সেটা বুঝলাম। একটা আস্ত জিনিসকে আলোক-সম্পাতের দ্বারা বিভিন্ন চেহারা দেয়া যায়—এটা সহজেই বোঝা যায়। একটি কিউবকে সামনে থেকে কড়া আলোয় উদ্ভাসিত করলে সেটাকে কিউব বলেই চেনা যায় না ; কারণ কোণাগুলো, ধারগুলো সম্মুখ আলোয় অদৃশ্য হয়ে যাবে। অথচ পাশ থেকে বা নীচ থেকে এক এক পাশকে আলোয় উদ্ভাসিত করলে কিউবটার নানা চেহারা বার করে দেয়া যায়।

ভাষাবিদ—অর্থাৎ এক এক পাশ আলোর, এক এক পাশ আঁধারে থাকলে তবেই তার কিউবত্ব স্পষ্ট হবে।

পরিচালক—সেইজন্যেই আধুনিক আলোয় আঁধারের গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়। আগে অভিনেতার অহমিকাকে সেবা করার জন্যে ছায়া বা আঁধারকে মঞ্চ থেকে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল। আধুনিক নাট্যশালায় অভিনেতাই তো সর্বেসর্বা নন ; নাটকের পরিবেশের খাতিরে এমনও প্রয়োজন হতে পারে যখন মঞ্চসজ্জার একটি অংশ উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হবে, অথচ অভিনেতাকে আধা-অন্ধকারে ঢেকে রাখা হবে। যেমন 'অঙ্গার' নাটকের শেষ দৃশ্য! বা 'পুতুলখেলায়' ডাক্তার-বাবুর বুলবুলকে প্রেমনিবেদন করার ক্রমঘনায়মান আঁধারের দৃশ্যটি। মনে হল মনের কথা বলতে বলতে দু জনের চেতনা থেকে পারিপার্শ্বিকের অস্তিত্বটাই মুছে গেছে, দু জনে কি একটা অন্য জগতে গিয়ে পৌঁছেছেন। উল্লিখিত দুটি দৃশ্যেই দৃশ্যসজ্জার কালো রং, আলো এবং নাটকের কথা

ও অভিনয় এক সুরে গেঁথে গেছে। নির্মল গুহরায় এবং খালেদ চৌধুরীর সঙ্গে তাপস সেন, তাপস সেনের সঙ্গে তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায় ও লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের টিমওয়ার্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলে গেছে।

নাট্যকার—হ্যাঁ, উল্লিখিত দৃশ্যদুটি আধুনিক আলোকসম্পাতের এক-একটি অপূর্ব নিদর্শন। তেমনি আমার মনে হয় 'রক্তকরবী'-র জাল খুলে রাজার বেরিয়ে আসাটিও আর-একটি চরম দৃষ্টান্ত। এখানে নাটকের স্বার্থেই আলোকসম্পাত ও ধ্বনিপ্রক্ষেপণ হঠাৎ সোচ্চার হয়ে মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে তোলে। 'অঙ্গারের' জলের দৃশ্যও তাই।

ভাষাবিদ—'অঙ্গার'-এর শ্রেষ্ঠ আলোকসম্পাত হয়েছে শেষ দৃশ্যে নয়, চতুর্থ দৃশ্যে যখন খনি-দুর্ঘটনার পরে শ্রমিকদের জীবনরক্ষার চেষ্টা চলছে। এখানে তাপসবাবুর আলো অস্থির ব্যাকুল.; রেসকিউ টীমের তৎপরতার সঙ্গে কি অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়েছে আলোর ছুটোছুটি!

দার্শনিক—আচ্ছা, এই নতুন ধরনের নতুন নাট্যাদর্শের আলোক-কল্পনাকে কার্যকরী করতে বিগত দিনের যন্ত্রপাতি তো যথেষ্ট নয়। তাপসবাবুর তথা আধুনিক মঞ্চের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কি রকম? পাওয়া যায় সেসব?

পরিচালক—মোটামুটি কিছু কিছু জিনিস পাওয়া যায়। সেগুলির প্রবর্তন হচ্ছে। পুরাতন ঝরি আর ফুট-লাইটের বেড়া ভেঙ্গে তাপস-বাবুরা আধুনিক সরঞ্জাম আনতে শুরু করেছেন। তার তালিকাও কম নয়; আশ্চর্য ব্যাপার—এতকাল বাংলা থিয়েটার চলছে, কিন্তু এই অতি-সাধারণ যন্ত্রগুলোও এদ্দিন আসে নি। এসেছে কিছু চমক-লাগাবার বাজে জিনিস; অদৃশ্য হওয়ার আয়না, আর ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আর রঙীন কাগজের চক্র! অথচ এতদিন আমাদের বড় বড় নাট্যরসিকরা থিয়েটারে চমক লাগাবার অপচেষ্টা দেখেন নি। আজ সেই তাপসবাবু মঞ্চের সামান্যতম ঠাঁট ফিরিয়ে আনতে কিছু যন্ত্র প্রচলন করছেন, অমনি আঙ্গিকের প্রাধান্য নিয়ে দক্ষযজ্ঞ বেধে গেছে।

দার্শনিক—আধুনিক থিয়েটারের আলোর সরঞ্জামের একটু আভাস দেবেন ?

পরিচালক—হ্যাঁ, দিচ্ছি। তবে স্বভাবতই আলোর আর বিদ্যুতের প্রবেশের সঙ্গেই থিয়েটারে বিজ্ঞানও প্রবেশ করেছে। কিছু কিছু অঙ্কও আমাদের কষতে হবে। আধুনিক থিয়েটারের প্রধান আলো হল—

(১) প্লেনো-কনভেকস্ লেন্স্ স্পট ;

(২) ফ্রেসনেল স্পট ;

(৩) এলিপসয়ডাল-রিফ্লেক্টর স্পট।

সবই স্পট দেখছেন ? ফ্লাড্-আদি যা ব্যবহার হয় মোটামুটি সাইক্লোরামাকে আলোকিত করতে বা অনুরূপ গৌণ স্থানে। আধুনিক মঞ্চে পাশ থেকে, সামনে থেকে, ওপর থেকে এবং নীচ থেকে যত আলো দেয়া যায় সব স্পট থেকে। কারণ স্পট-এর আলো-কে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তার জোরালো আলো শিল্পীর হাতের মুঠোয়। লেন্স্-এর ব্যবহার আলোর দূরত্ব সত্ত্বেও তার শক্তি, তার তীব্রতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে। ২৫০ ওয়াট, ৫০০ ওয়াট, বা ১০০০ ওয়াট বা ১৫০০ ওয়াট যে ল্যাম্পই ব্যবহার করুন না কেন আলোর ক্যাণ্ডল-পাওয়ারকে নানা লেংথ-এর লেন্স্ ব্যবহার করে নিজের হাতের মুঠোয় আনতে পারা যায়।

$$F.c. = \frac{c.p.}{d^২}$$

$F.c.$ অর্থে ফুট-ক্যাণ্ডল্, $c.p.$ মানে ক্যাণ্ডল্-পাওয়ার, d অর্থে দূরত্ব। তাহলে ধরুন কুড়ি ফুট দূরে একটি মাঝারি আকারের স্পট আছে, তাতে একটি ১৫০০ ওয়াটের বাল্ব্ আছে। কত ফুট-ক্যাণ্ডেল্ আলো পাবো ? ফরমুলা প্রয়োগ করে কি পাচ্ছি ? ১৫০০ ওয়াট বাল্ব্ থেকে লেন্স্-এর মাধ্যমে পাচ্ছি ১৬,০০০ ক্যাণ্ডল-পাওয়ার। অতএব,

$$F.c. = \frac{১৬০০০}{২০^২} = \frac{১৬০০০}{৪০০} = ৪০$$

অর্থাৎ ৪০ ফুট ক্যাণ্ডল্ আলো পাবে। ঐ ফর্মুলা থেকে জ্ঞাতব্য সব তথ্যই তো পেতে পারি, কারণ,

$$c.p. = d^2 \times F.c. \text{ এবং } d = \frac{c.p.}{F.c.}$$

কি বলছি বুঝতে পারছেন ?

দার্শনিক—হ্যাঁ।

পরিচালক—তাই বলছিলাম ৮″, ৬″, ৫″, ৩″—নানা রকমের লেন্‌স্ ব্যবহার করে আধুনিক থিয়েটার আলোর ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে। এর ওপর এসেছে ডিমার—প্রত্যেক আলোর আলাদা ডিমার ; আলোকে ক্রমশ বাড়ানো এবং কমানোর জন্যে। এরই ফলে সম্ভব হয়েছে দর্শকের প্রায় অজান্তে একটি দৃশ্যের মধ্যেই আলোকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা। এরই ফলে সম্ভব হয়েছে 'অঙ্গারের' চতুর্থ দৃশ্যের শেষে প্রচণ্ড, হতাশার ছবি ফুটিয়ে তোলা—সমস্ত আলো ক্রমশ নিভে গিয়ে একটি আর্তনাদের মতন লাল আলোকরেখার দ্বারা খনিমুখের বৃহৎ লৌহতোরণকে আঘাত করা। তারপর আরো একটি জিনিসকে প্রচলন করেছেন তাপসবাবু ; কাট-অফ্ বা আলোর মুখোশ। বিদেশের থিয়েটারে কাট-অফ্ ছাড়া আলোর ব্যবহার কেউ ভাবতেই পারে না। কাট-অফ্-এর ব্যবহার কেন ? অবাঞ্ছিত জায়গায় যাতে আলো না পড়তে পারে ; তাছাড়া আলোরও আকার নির্ধারণ করার জন্যে।—ফানেল, শাটার, ম্যাট, আইরিস নানা রকম মুখোস পরিয়ে আলোকে বাঁকানো-চোরানো যায় এটা এদ্দিন অভিনেতার দাস বাংলা থিয়েটারে কারুর মাথায় খেলে নি। তাপসবাবু এই কাট-অফ্-এর কায়দাকে কোথায় এগিয়ে নিয়ে গেছেন, কিভাবে সচল কাট-অফ্-এর ব্যবহার শুরু করেছেন তা বোধহয় পৃথিবীর নাট্যশালার ইতিহাসে লিখিত হওয়ার যোগ্য।

নাট্যকার—সচল কাট-অফ্ মানে ?

পরিচালক—তাপসবাবুর অনুমতি ছাড়া বলতে পারলাম না এর বেশি। উনি নিজেই বিস্তারিত বলবেন এই আশায় এটুকু বলেই ক্ষান্ত

হলাম। এরপর আসছে রং-এর ব্যবহার। আগে লাল, নীল, সবুজ আলোর অসংযত ফোকাশ-মারা আপনারা দেখেছেন। এমনকি আর্ক-ল্যাম্পের সামনে নানা রং-এর জিলেটিন-আঁটা চক্রও ঘুরিয়ে দিয়ে মঞ্চে ঘন ঘন রং পরিবর্তন করে বালসুলভ কুরুচির পরিচয় দেয়া হত; এখনো অধিকাংশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের অভিনয়ে দেয়া হয়। সদর্পে বলছি, তাপসবাবু প্রথম শিল্পসম্মত রং-এর ব্যবহার চালু করেছেন। গাঢ় লাল, গাঢ় নীল, গাঢ় সবুজ প্রভৃতিকে সংযত করে শুধুমাত্র চরম কয়েকটা মুহূর্তে ব্যবহার প্রথম তাপসবাবুই করলেন। এইসব রং-এর মুশকিল কি জানেন? এরা আলোর তেজ কমিয়ে দেয়, গাঢ় লাল শতকরা মাত্র ১০ ভাগ আলোকে লক্ষ্যে পৌঁছতে দেয়। গাঢ় সবুজও তাই; আর গাঢ় নীল মাত্র ৩ ভাগ আলো-কে যেতে দেয়। অথচ সমস্ত দূরত্ব ঘনত্ব ছায়াময়তাকে হত্যা করে যে সাদা আলো তার ব্যবহারের রেওয়াজও উঠিয়ে দিয়েছেন তাপসবাবু। হালকা এম্বার বা গোলাপী ধরনের একটা ফিকে রংই হচ্ছে তাপসবাবুর সর্বোজ্জ্বল রং। এম্বার শতকরা ৮০ ভাগ এবং গোলাপী শতকরা ৬৫ ভাগ আলোকে নির্বিঘ্নে লক্ষ্যে পৌঁছতে দেয়; অথচ মঞ্চের স্বপ্নময়তাকে ভেঙ্গে তছনছ করে না। তাপস সেনের আর-একটি প্রবর্তন—মোটিভেটিং লাইট। একটা দৃশ্যের প্রধান আলোকের উৎসটা ঠিক করে পুরো দৃশ্যের আলোটাকে সেই প্রধান আলোর পরিপ্রেক্ষিতে ঐক্যবদ্ধ করা—এই জিনিসটাও এদ্দিন আমাদের থিয়েটারে আসে নি। জানলা দিয়ে দিনের আলো আসছে—পুরনো থিয়েটারে জানলার উপর পেছন থেকে কড়া ফ্লাড লাইট মেরেই খালাস; সামনের আলোগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সামনে থেকে ততোধিক কড়া রশ্মিপাত করে বিপর্যয় ঘটাত। তাপস সেনের সূর্যের আলো, বা চাঁদের আলো দেখেছেন? বা মঞ্চের উপর জ্বলন্ত হারিকেন বা বৈদ্যুতিক বাতি থাকলে তার আলোয় উদ্ভাসিত মুখ বা আসবাব বা দেয়াল দেখেছেন? 'ফেরারী ফৌজে' হারিকেন নিয়ে মা আর অশোকের দৃশ্যটা দেখেছেন? তার চাইতেও অপূর্ব মোটিভেটিং

আলোর প্রয়োগ দেখেছিলাম 'সাংবাদিক' নাটকের শেষ দৃশ্যে, যখন একটি বেতারযন্ত্রের আলোকোদ্ভাসিত ডায়াল-এর আলোয় নায়কের মুখখানা দেখতে পেয়েছিলাম। মনে রাখবেন ঐ নাটকের ঐ দৃশ্যে রেডিওটি একটি প্রধান চরিত্র। আরো বহু জিনিসের ব্যবহার তাপসবাবু চালু করার চেষ্টা করছেন—লিনেবাখ্ ল্যাটার্ন, ক্লাউড-মেশিন, এনিমেটেড স্লাইড—। ধোঁয়ার ব্যবহারটাই দেখুন না! আগে কেউ ভেবেছিলেন ধোঁয়ার ওপর আলো খেলিয়ে নানা প্যাটার্ন সৃষ্টি করা যায়?

নাট্যকার—কিন্তু ওগুলো যে নিছক প্রকৃতিকে নকল করার যন্ত্র, বাস্তবতার নামে স্বাভাবিকতার বিষ!

পরিচালক—আগেই তো বলেছি, সেই বাস্তবতাও এখনো আমাদের থিয়েটারে আসে নি। তাকে আনা প্রয়োজন। তার পরে এগুতে পারব বাস্তবোত্তর শিল্পের দিকে। তাপসবাবুর অন্তরে যে স্বপ্ন আছে 'শিশুতীর্থ' পরিকল্পনায় তার কতকটা আঁচ আমরা পেয়েছি। আজ যে তিনি নিজেকে সংযত করে, খাটো করে থিয়েটারকে বাস্তবতার দিকে নিয়ে চলেছেন, তার জন্যে তাঁর এই সাময়িক আত্মত্যাগের জন্যে তাঁকে আমাদের অভিবাদন জানানো উচিত। তাপস সেন যে শিল্পী তার কি প্রমাণ জানেন? এইসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছাড়াও আশ্চর্য সব দৃশ্য তিনি সৃষ্টি করেন উদ্ভট, ফেলে-দেয়া জিনিস দিয়ে। একটি ভাঙা মোড়া দিয়ে 'নীচের মহলে' মোটরগাড়ি চালিয়েছিলেন। কতকগুলো বিয়ে বাড়ির রানিং লাইট, কয়েকটা পুরনো বিস্কিটের টিন, কিছু ছেঁড়া কার্ডবোর্ড—এইসব হচ্ছে তাঁর আসল উপকরণ। এসব মিলিয়ে যা হয় তা দেখে আমার বিশ্বাস হয়—ইনি বা এঁর উত্তরসূরীরা নিয়ে যাবেন থিয়েটারকে সেই বাস্তবোত্তর স্বপ্নজগতে যেখানে গড়ে উঠবে থিয়েটারের ভাষা।

সংগীত

পরিচালক—বাংলা নাট্যশালায় সংগীতের ব্যবহারও অভিনেতা মহোদয়ের একাধিপত্যে স্বকীয়তায় ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে নি। অর্থাৎ আবহসংগীত জিনিসটাই সৃষ্টি হয় নি। সংগীত তার নিজস্ব রূপে নাট্যশালায় বিকশিত হতে পারে না, এটা নিশ্চয়ই মানবেন। নাট্যশালার সংগীত ভিন্ন জিনিস। এই নাট্যসংগীত সৃষ্টি হয় নি।

দার্শনিক—নাট্যশালার সংগীত স্বাধীন নয়, এটা মানছি। সংগীত শ্রেষ্ঠ কলা। নিকৃষ্ট কোনো কলার পরিসরে সে নিজেকে মেলে ধরবে কি করে?

পরিচালক—শুধু শ্রেষ্ঠ কলা বললে ভুল হবে। সংগীত এবস্ট্রাক্ট কলা; সংগীত বস্তুনিরপেক্ষ, বিমূর্ত। অথচ নাট্যশালার সংগীতকে কোনো একটা বিশেষ পরিবেশ, বা বিশেষ আবেগকে রূপ দিতে হয়। ওরকম সুনির্দিষ্ট কাজে সংগীতকে নিয়োজিত করা অসম্ভব।

ভাষাবিদ—এটা কি ঠিক বলছেন? পাশ্চাত্ত্য সংগীতে যাকে ভিভিড মিউজিক বলে তাতে তো যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তবতার ধ্যান দেখতে পাচ্ছি। যেমন ধরুন, চাইকোভ্স্কি-র '১৮১২ ওভার্চার': নেপোলিয়নের মস্কো থেকে পশ্চাদপসরণ অবলম্বনে রচিত। স্পষ্টই এর মধ্যে তুষারঝড়, সৈন্যদের ক্লান্ত পদক্ষেপ এবং অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শোনা যায়। এক্ষেত্রে সংগীত বস্তুনিরপেক্ষ না হয়ে একান্তভাবেই বাস্তব-ভিত্তিক।

নাট্যকার—আবার দেখুন রসিলি-র 'বার্বার অফ্ সেভিল্' ওভার্চার; যেখানে একটি অতীব আমুদে চরিত্রের মনোবিকলন করা হয়েছে। ফিগারো-চরিত্র হাসছে, গাইছে আর খাটছে প্রভুর মনোরঞ্জনার্থে। এই ফিগারোর চরিত্র হচ্ছে ঐ ওভার্চারটির বিষয়বস্তু। এখানেও সংগীত বিমূর্ত নয়।

পরিচালক—আপনারা যে উদাহরণ দুটি দিলেন, দুটিই ওভার্চার। আর ওভার্চার মানেই অপেরা-র সংগীত। অপেরা তো নাট্যশালার ব্যাপার। অপেরায় গল্প আছে, অভিনয় আছে, ঘটনা আছে, চরিত্র-

বিশ্লেষণ আছে। অপেরা হল নাটকেরই আরেক রূপ। সেই অপেরার জন্যে লেখা সংগীতকে খাঁটি মার্গসংগীত বলছেন কি করে? উপরন্তু ঐ ওভার্চারগুলোর ভিত্তিতেই আধুনিক থিয়েটারের সংগীত রচিত হবে। খাঁটি মার্গসংগীতে বাস্তবের আঁচ যা একটু পেয়েছি তা হচ্ছে বেঠোফেন-এর 'ষষ্ঠ সিমফনি'-তে। প্রথম চারটি খণ্ডই প্রাকৃতিক পরিবেশে সংগীতকারের উচ্ছ্বাস নিয়ে রচিত। বিশেষ করে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে পাখীর ডাক এবং চতুর্থ খণ্ডে ঝড়ের গর্জন একেবারেই বাস্তব-ভিত্তিক। কিন্তু দেখুন শেষ খণ্ডে সমস্ত বাস্তবকে অতিক্রম করে 'মেষপালকদের ব্রহ্ম-সংগীত' এক বাস্তবোত্তর জগতে পৌঁছে গেছে। বেঠোফেন-এর এই সিমফনিটি ছাড়া পাশ্চাত্ত্য মার্গসংগীতে তথাকথিত বাস্তবতা কোথাও আমার কানে বাজে নি। শুবের্ট দেখুন, ব্রাহম্‌স্ দেখুন, দেখুন বেঠোফেন-এর বিখ্যাত পঞ্চম বা নবম সিম্‌ফনি।

ভাষাবিদ—আধুনিক সংগীতকারের সংগীতে যে মেশিন-এর ঝংকার শোনা যাচ্ছে সে সম্বন্ধে কি বলবেন? যেমন স্ট্রাভিন্‌স্কি।

পরিচালক—পাশ্চাত্ত্য সংগীত যুগে যুগে রচিত হয়ে চলেছে। মেশিনের ঝংকার যা শুনছেন তা সংগীতকারের আধুনিক মনের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন। মেশিন-যুগের সংগীতকারের মধ্যে সংগীতের নিটোল মিঠে সুর যদি না বাজে তাকে কি আপনি বাস্তব-ভিত্তিক বলবেন? এঁদের সংগীত যদি পুরনো হার্মনির তত্ত্বকে ভেঙে গুঁড়িয়ে, আরপেজিও আর মেজর-মাইনরের বন্ধন ভেঙে জাজ আর মার্গ-সংগীতের তফাত ঘুচিয়ে নূতন রুক্ষ, 'অমার্জিত' সুর সৃষ্টি করে, তবে তা যুগের দাবীতেই করছে। তাকে বাস্তব-ভিত্তিক বলা ভুল। কোনো বিশেষ আবেগ, বা বিশেষ চরিত্র, বা বিশেষ ঘটনাকে তো এঁরা রূপ দিচ্ছেন না। এঁরা নবযুগের সামগ্রিক আবেগকে তুলে ধরেছেন। জর্জ মাহ্‌লের-এর 'সং অফ্ দি আর্থ' শুনুন; আমার কথা পরিষ্কার হবে।

ভাষাবিদ—প্রোকোফিয়েফ-এর 'লাভ অফ্ দি থ্রি অরেঞ্জেস'?

পরিচালক—সে তো বাস্তব-ভিত্তিক হবেই ; আবার অপেরার কথা তুলছেন ? হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ভারতীয় মার্গসংগীতে তো বাস্তবের কোনো রেশই নেই। খাঁটি এব্‌স্‌ট্র্যাক্ট সংগীত হল ভারতের মার্গ-সংগীত, আমাদের রাগরাগিণী।

নাট্যকার—বাস্তবের রেশই নেই—একথা মানতে পারলাম না। ঋতুসংগীত দেখুন—বসন্ত বা বাহারে একটি বিশেষ ঋতুর ছায়া আসছে কিনা ! মল্‌হারে বর্ষার রূপ ধরা পড়ছে না ? আবার দেখুন প্রাতর্গেয় এবং রাত্রিগেয় রাগের পার্থক্য নেই ? ভৈরোঁ রাগে ভোরের চেহারা স্পষ্ট। কেদারে চাঁদনি রাতের আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

পরিচালক—দেখুন, যে-কোনো অভিব্যক্তির জন্যে সিম্‌বলিজম্ চাই, একটা আত্মলব্ধ সংকেত চাই। সংগীত-বিশারদ রবীন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের ভাষায় 'আত্মার প্রয়োজনে' এই সংকেতের সৃষ্টি, 'আত্মার প্রয়োজনে তার জন্ম, আত্মার একত্বে তার পরিণতি'। ভারতীয় রাগ-সংগীতের কলাকৌশলের পুরোটাই এই সিম্‌বলিজম্। গানের ঋতু বা সময় এই ধরনের সিম্‌বলিজম্-এর প্রকাশ। একটা ভিত্তি ঠিক করে নিয়ে গায়কের আত্মার প্রকাশের ব্যবস্থা। ঐ ভিত্তিটুকুকে প্রধান করার কথাই উঠতে পারে না। ভৈরোঁ-র কোমল রেখাব এবং কোমল ধৈবতে ভোরের ছোঁয়া থাকতে পারে। কিন্তু ভৈরোঁ-র দ্রুত তাল যখন শুরু হয় তখনো কি বলতে চান ভোরের আভাস পান ? বাহার-এর তান দিতে গেলে বক্রভাবে দিতে হয় ; সরল তান দিলে হুড়মুড় করে আড়ানা, বাগেশ্রী প্রভৃতি ঢুকে পড়বে ; সেই বক্রতানেও কি বসন্ত ঋতুর চেহারা পান ? আর বড় ওস্তাদের কাছে প্রাতর্গেয়-রাত্রিগেয় প্রভৃতির পার্থক্য ঘুচে গেছে ! 'বসন্ত' রাগের কথা বললেন ; বসন্ত শেষরাত্রে গাওয়ার কথা। আমি মাঝরাত্রে বসন্ত শুনেছি ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খাঁ সাহেবের কণ্ঠে ; সকালে রোদ ওঠার পর শুনেছি নিসার হোসেন খাঁ সাহেবের কণ্ঠে ; দুটোই সংগত মনে হয়েছে, আমার কিস্যু অসুবিধে হয় নি। ভৈরবী গাওয়া হবে কখন ? ভর-সন্ধ্যেয় ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের

গলায় শুনেছি ঃ মনে হয়েছে—হ্যাঁ, এ রাগ সন্ধেকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট। সেই ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠে ভোরবেলায় শুনেছি—বাজু বন্দ খুলু খুলু যাউ—মনে হয়েছে, হ্যাঁ, এতো ভোরেরই রাগ। আবার এই সেদিন ওস্তাদ লতাফৎ খাঁ সাহেব ভৈরবী গাইলেন মাঝরাত্রে—মনে হলো, এ তো রাত্রেরই রাগ। মল্হারে বর্ষার রূপ ফোটে, ঠিক কথা। আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপও ফোটে। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠে ধ্রুপদ শুনেছেন—'বরসত ঘন শ্যাম'? বিলায়েৎ হোসেন খাঁ সাহেবের খেয়াল শুনেছেন—'মহম্মদ শা রংগীলে'? 'করিম নাম' খেয়ালটিতে তো বর্ষার রূপ নেই, যদিও মিয়া কি মল্হার রাগে রচিত। এই রাগে 'বরসন লাগীরে বদরিয়া' গানও যেমন আছে, 'বোলি রে পপৈয়া' গানও লেখা হয়েছে। না, আমার মনে হয় ঋতু বা সময় রাগসংগীতের একটা কাঠামো মাত্র। ভেতরের রক্তমাংসটা একেবারে এব্‌স্ট্রাক্ট। মল্হারের ধমার শুনেছিলাম ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠে; আমার কানে মেঘগর্জন বা বাতাস ধ্বনিত হয় নি; হয়েছিল 'খেলন আয়ে', অতীব চটুল চপল একটি নারীর মূর্তি। আবার সেই খাঁ সাহেবের ছায়ানটে খেয়াল শুনেছি, যেখানে ঝড় বাতাসের নামগন্ধ থাকার কথা নয়; অথচ দমকা ভিজে বাতাসে বারবার মনে দোলা লেগেছিল। কেদারে চাঁদনি রাতের ছায়া আমি কোনো ওস্তাদের কণ্ঠে পাইনি: ও শুধু বইয়েই পড়েছি। অথচ সংগীত-রসিকশ্রেষ্ঠ অমিয় সান্যাল মহাশয় ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কেদারে ভিন্ন রূপ পেয়েছেন; উনি দেখেছেন—পঞ্চম যেন মহাবীর; বারবার সে পৃথিবী সেঁচে নানা উপঢৌকন এনে লাস্যময়ী মধ্যমার পায়ে নিবেদন করছে; কিন্তু মানিনীর মান ভাঙছে না। না, মশায়রা, রাগসংগীতে নিছক বাস্তবকে খুঁজতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা।

নাট্যকার—সেইখানেই তো গণ্ডগোল! বাস্তবের সঙ্গে আমাদের রাগ-সংগীতকে যদি একেবারেই জুড়তে না পারা যায়, তবে তো নাট্যশালায় রাগসংগীতকে ব্যবহার করা অসম্ভব।

পরিচালক—এক্স্যাক্‌ট্‌লি, রাগসংগীতকে নিজস্ব রূপে ব্যবহার

করা অসম্ভব। আরো দেখুন, শুধু যে সময়-ঋতু-ঝড়বৃষ্টি-চাঁদ এ সংগীতে নেই তা নয় ; আবেগকেও প্রাধান্য দেয়া এ সংগীতে চলে না। আবেগের বাড়াবাড়িতে ঠুমরি সৃষ্টি হয়, খেয়াল হয় না ; ধ্রুপদ ধমার তো নয়ই। আবেগের কাতরতা নিকৃষ্ট কলার অঙ্গ। মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আবেগকে অতিক্রম ক'রে মহৎভাবের সঞ্চার করে। মশাই, চোখে জল আসে 'অরক্ষণীয়া' পড়ে, কিন্তু 'হ্যামলেট্' পড়ে চোখ সিক্ত হয় না, বুক ভরে যায়। ভারতীয় রাগসংগীতের বেলায়ও তাই। রবীন্দ্রলাল রায় মহাশয় বলছেন, "মনের দিক দিয়েও রাগের গোড়ার কথা প্রশান্তি ; আবেগ অথবা উদ্বেগহীনতা···গান করতে বসে সুর যদি নিতান্ত করুণ হয় তাতে আবেগের যাথার্থ্য প্রমাণ হয়, কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না।" এই সম্রাটোপম প্রশান্ত রাগসংগীতকে থিয়েটারের গোয়ালে আটকাবে কে ?

ভাষাবিদ—তবে এতকাল ধরে বাংলা নাট্যশালা কি সংগীত চালিয়েছেন ? নবনাট্য আন্দোলনই বা সংগীতকে কি করতে চাইছেন ?

পরিচালক—এতকাল বাংলা নাট্যশালা সমস্যাটার সম্মুখীনই হয়নি। সমস্যাটাকে এড়িয়ে গেছে। যাত্রার হার্মোনিয়াম, কর্নেট, বাঁশি, ক্ল্যারিনেট, বেহালার সঙ্গে জুড়েছে অর্গ্যান ; এই বিচিত্র অর্কেস্ট্রা দিয়ে যাত্রার সুর বাজিয়েছে। অর্থাৎ দেশ, বাগেশ্রী বা খাম্বাজ রাগকে ভিত্তি করে একটু কনসার্ট বাজিয়েছে। তাও ড্রপ ওঠার আগে বা ড্রপ পড়লে পরে। নাটকের মধ্যে বেজেছে শুধু একটু যুদ্ধের বাজনা। এ ছাড়া নাটকের মধ্যে রাগ-ভিত্তিক গান দেয়া হয়েছে পাঁচ-সাতখানা ক'রে ; দু-একটি গান ছাড়া এরা নাটকের বিষয়বস্তু বা পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ; সুতরাং এরা নাটকের গতিকে ব্যাহত করেছে। মোটকথা সংগীতকে আমলই দেয়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথ প্রথম গানকে সত্যিকারের ব্যবহার করে দেখালেন কিভাবে গানের কথার সঙ্গে, সুরের সঙ্গে নাটকের সাযুজ্য ঘটাতে হয়। 'রক্তকরবীতে' "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে"টা ভাবুন, বা 'অচলায়তনে' "কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন",

অথবা 'তপতীতে' "তোমার আসন শূন্য আজি"। একটা বিশেষ মুহূর্তে এসে যখন আর কথায় কুলোয় না, তখনই যেন নাটকটি গানের সুরে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এও আবহ-সংগীত নয়। এ-ও গান। আবহ-সংগীত অন্য জিনিস। সে ভাষাহীন। সে স্বাতন্ত্র্যহীন। সে একান্তভাবেই নাটকের অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ সেদিকে এগোননি।

নাট্যকার—গণনাট্য সংঘ কিছু করেছেন?

পরিচালক—চেষ্টা করেছেন, পারেননি। আগেই বলেছি গণনাট্য সংঘ পুরনো নাট্যশালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে সেই নাট্যশালারই কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন; অভিনেতাকে একেবারে একমাত্র অধিপতি করে তুলেছেন। তাই সংগীতকে তাঁরা যথার্থ মর্যাদা দিতে পারবেন না—এ আর আশ্চর্য কি? না, গণনাট্য সংঘও আবহ-সংগীতকে রচনা করে নিতে পারেননি। তারপর পেশাদার এবং অপেশাদার অভিনয়ে এল আর এক দৌরাত্ম্য: ঐ কনসার্টের নূতন রূপ—ইলেক্‌ট্রিক গিটার আর ঝাঁজ। এঁরা কনসার্ট ছাড়াও আবহ-সংগীতের খোকামি শুরু করলেন। এখনও তাই চালাচ্ছেন। এই আবহ-সংগীত কিরকম জানেন? ধরুন নায়ক বললেন, মীরা, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আর আমাদের দেখা হবে না। মীরা বললেন, ওগো! কেন? সঙ্গে শুনবেন বেড়ালের ডাক। মানে গোড়ায় মনে হবে বেড়ালের ডাক, তারপর বুঝবেন ওটা গিটার আর বাঁশি: ওঁরা করুণ-রস সৃষ্টি করছেন। ধরুন খল-নায়ক বললেন, কোথায় যাচ্ছ মীরা? অসীমকে আমার গুণ্ডারা খুন করেছে! এই কথাগুলো যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা বোঝাবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে বিষম হট্টগোল করে ঝাঁজটাঁজ বেজে উঠবে। এগুলো বাঁধা ফর্মুলা। আর একর্ডিয়ন, গিটার প্রভৃতি সংযোগে যে কনসার্টটা বাজে সেটাতে রাগের ভিত্তি আর পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমশঃ মার্কিন ফক্‌স্‌-ট্রটের সুর ধ্বনিত হতে শুরু হয়েছে। খুবই দুঃখের বিষয় প্রান্তিক-এর 'বিশে জুন'-এর মতন নাটকে মার্কিন সংগীতের নাম করে 'টার্কিশ পোঁলের' মতন জঘন্য শস্তা সংগীত বাজিয়ে নাটকের

আবহাওয়ার বারোটা বাজানো হয়েছে। নাটকের সংগীতকার বোধহয় জানেন না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত আছে!

নাট্যকার—মধু বসু-র ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়াস-এর সঙ্গে তিমিরবরণ চেষ্টা করেছিলেন তো সত্যিকারের আবহ-সংগীত সৃষ্টি করতে।

পরিচালক—করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষা ব্যর্থ হল কেন জানেন? তিমিরবরণ বুঝেছিলেন—খাঁটি রাগসংগীতকে থিয়েটারে আনা অসম্ভব। অথচ একটা নাটকের সংঘাত-আবেগ প্রভৃতিকে রূপ দিতে গেলে কনসার্ট বাজালে চলবে না, আবার গিটার-ঝাঁজের গাধামিও চলবে না। উনি বুঝেছিলেন নূতন ধরণের অর্কেস্ট্রা প্রয়োজন। অর্কেস্ট্রাই পারে নানাধরণের শব্দসমষ্টি সৃষ্টি করতে। শব্দ; সংগীত নয়; শব্দ কখনো এলোমেলো হবে, কখনো ধীরমধুর হবে, কখনো বা আবার গর্জন করে উঠবে। কিন্তু রাগসংগীতের প্রশান্ত গভীর সুর সে রকম বৈচিত্র্য আনতে অক্ষম; সে বৈচিত্র্য আনলে সেটা আর রাগ-সংগীত থাকতো না। অতএব তিমিরবরণ স্বরোদ সেতারের সঙ্গে আরো বহু যন্ত্র জুড়ে সুরসৃষ্টি করতে বসলেন। কিন্তু রাগসংগীতের বন্ধন কাটাতে পারলেন না। পিলু বা বাহার রাগের নির্দিষ্ট সরগমকে অতিক্রম করতে পারলেন না। ফলে তাঁর সংগীত এদিকেও গেল না, ওদিকেও গেল না। অর্কেস্ট্রা ব্যবহার করব, অথচ মেলোডিকে ভাঙতে পারবো না—এরকম দ্বিধায় পড়লে সৃষ্টি ব্যর্থ হতে বাধ্য। অর্কেস্ট্রাকে মানলেই পাশ্চাত্য সংগীতের ডায়া-টোনিক স্কেলকে মানতে হবে, থিয়োরি অফ হার্মোনিকে মানতে হবে। তিমিরবরণ পারেননি হার্মোনি সৃষ্টি করতে।

ভাষাবিদ—আপনারা কি তাই চাইছেন? আপনারা কি ভারতীয় নাট্যশালায় হার্মোনি চালাবেন? রাগসংগীত বিসর্জন দেবেন?

পরিচালক—রাগসংগীতকে বিসর্জন তো দেবই, কারণ সংগীতকেই যে বিসর্জন দেব। আমরা চাইছি নাট্যশালার আবহ-সংগীত। কোনো সংগীতকেই সেখানে স্বকীয়তা নিয়ে আসতে দেব না; আবহ-সংগীত মানেই পরাধীন সংগীত। সমগ্র নাটকের মধ্যে সে লুপ্ত। রাগসংগীত সেখানে

বিদ্রোহ করে বসবে। অন্যপক্ষে বেঠোফেনও সেখানে বিদ্রোহ করে বসবেন। নাট্যশালা চাইছে রাগসংগীত বেঠোফেন সবকিছুকে জড়িয়ে একটা নতুন সংগীত। আর আমার মনে হচ্ছে পাশ্চাত্য হার্মোনি-র থিয়োরি এ ব্যাপারে একটা নির্দেশ দিচ্ছে। কারণ হার্মোনি-র ব্যবহারে শব্দ-সমষ্টির নানা বৈচিত্র্য আনা যায় ; মিঠে-মধুরের মায়া কাটানো যায় ; প্রয়োজনমত সংগীতকে নানা পর্দায় নানা কম্বিনেশনে দৌড় করানো যায়। আসল কথা হচ্ছে, রাগসংগীতের কঠোর নিয়ম আমরা গানের আসরে মানবো, থিয়েটারে নয়। আসরে কোনো ওস্তাদ যদি দরবারি-তে কোমল-গান্ধার ঠিকমতো না লাগাতে পারেন তবে রেগে যাবো। কিন্তু থিয়েটারের ওস্তাদ যদি গান্ধার-বর্জিত এক দরবারি রচনা করে বসেন আর সেটা যদি আমার নাটকের রূপকে প্রতিফলিত করে তবে আমি তাকে সাদরে গ্রহণ করবো। 'ফেরারী ফৌজ'-এর আবহ-সংগীতে যোগ নায়কি কানাড়া প্রভৃতি ব্যবহার হয়েছে ; অথচ বারবার সব নিয়ম লঙ্ঘন করে কাউন্টার পয়েন্ট গর্জন করে উঠেছে, 'যোগ' রাগ হঠাৎ মালকোষের দিকে ছুট দিয়েছে, নানা যন্ত্রের নির্ঘোষ হঠাৎ মূল সুরটিকে চেপে দিয়েছে। আমার মনে হয়েছে 'ফেরারী ফৌজ'-'এর উদ্দাম বিপ্লবীদের জীবন ঐ রকমই হয়। সেই বাঁধনছেঁড়া জীবনকে প্রকৃত রূপই দিয়েছেন রবিশঙ্কর। 'অঙ্গারে' জলোচ্ছ্বাসের দৃশ্যে পুরো অর্কেস্ট্রার স্থান দখল করেছে একটি সেতারের ঝালা--সেটিকে তখন যথার্থ জলের তোড় মনে হয়েছে বলেই তা সার্থক। আবার প্রথম দৃশ্যের শেষে সনাতনের "জান বাঁচাও" চীৎকার থেকে ধরে নিয়ে যে সংগীতাংশটি, তা খাঁটি য়ুরোপীয় রীতিতে সৃষ্ট ; কিন্তু নাটকের ঐ মুহূর্তটিকে অকস্মাৎ বিরাট বৃহৎ করে তুলেছে বলে ও-টিও সার্থক।

নাট্যকার—উঃ থামুন দিকি মশায়! আর এক রাউণ্ড চা হোক!

অভিনয় সম্বন্ধে যেদিন আলোচনা হবার কথা ছিল, সেদিন নাট্যকার প্রায় এক সংকট উপস্থিত করে ছাড়লেন। তিনি বাংলার এক জবরদস্ত অভিনেতাকে চা-কেকের লোভ দেখিয়ে আড্ডায় উপস্থিত করলেন।

পরিচালক তাঁকে দেখেই আঁৎকে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমরা টেনে বসালাম। বললাম—মশাই, প্রতিপক্ষ জোরদার না হলে কখনো বিতর্ক হয়? সন্ধি হলো, রামমোহন-সুব্রানিয়াম তর্ক সুরু হলো, আমরা জমিয়ে বসলাম।

পরিচালক সুরু করলেন—এতকাল বাংলা নাট্যশালা অভিনেতাদের লীলাক্ষেত্র ছিল, অভিনেতাদের আস্ফালনের আখড়া ছিল। এই অভিনয় কি ধরনের ছিল আগে বুঝতে হবে।

অভিনেতা বললেন—আমি বলছি। এতদিন, মানে আপনারা নটচাংড়ারা আসার আগে পর্যন্ত, অভিনেতা আবেগের গভীরে ডুবতে জানতেন। অভিনয় করতে করতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে জানতেন। অহীনবাবুর সাজাহান দেখেছেন? কয়েকটি দৃশ্যের পর থেকে যে প্রচণ্ড আবেগ অনুভূত হতো তাঁর অভিনয়ে, আপনাদের শম্ভু মিত্রের বাঁধাধরা গলার খেলায় তা কস্মিনকালেও ফোটেনি। ছবিবাবুর স্নুটু দেখেছেন? হলপ করে বলতে পারি ছবিবাবু আশেপাশের সব ভুলে গিয়ে সে পার্টে ডুবে যেতেন। আর তাকেই বলে আর্ট। অভিনয়ের মুকুট-মণি ডেভিড গ্যারিক বলতেন, 'the greatest strokes of genius have been unknown to the actor himself, till circumstances, and the warmth of the scene, has sprung the mine as it were, as much to his own surprise as that of the audience'। অন্যের লেখা কথা মুখস্থ করতে করতে, অন্যের সৃষ্ট দৃশ্যে অভিনয় করতে করতে অভিনেতার নিজের অজ্ঞাতেই হঠাৎ এমন আশ্চর্য এক আবহাওয়া গড়ে ওঠে, এমন নতুন রূপে হেসে ওঠে চরিত্রটি যে সেই মুহূর্তে অভিনেতা হয়ে ওঠেন স্রষ্টা! তিনি আর তখন নাট্যকারের দাস থাকেন না, তিনিও সৃষ্টি করেন।

ভাষাবিদ বললেন—গ্যারিকের যে উদ্ধৃতি দিলেন সেটা ফরাসী অভিনেত্রী মাদাম হিপোলাৎ ক্লেরো সম্বন্ধে তাঁর এক রচনা থেকে। ক্লেরোর কণ্ঠস্বর, অঙ্গ সঞ্চালন সবই নিখুঁৎ ছিল, তবু প্রাণ যেন তিনি

প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। কারণ তাঁর মধ্যে প্রতিভার "electrical fire" ছিল না। ঐ electrical fire কথা ছুটিও গ্যারিকের! সে fire যাঁর আছে তিনি তাঁর পার্টকে অতিক্রম করে মহৎ শিল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম। সমস্ত আইনের ঊর্ধ্বে উঠে, হোরেস-এর ভাষায় "পেকাতুস্ ইনানিতের আন্জিৎ, ইরিতাৎ, মুলকেৎ, ফালসিস্, তেররিবুস, ইমপ্লেৎ উৎ মাজুসজ" যাদুকরের মতন অভিনেতা অজানা-অচেনা রূপকথার সব ভয়-ভাবনা আর সৌন্দর্যকে জাগিয়ে তোলেন, আগুন ধরে যায় তার নিজের হৃদয়ে।

পরিচালক নাট্যকারের চুরুটের স্তূপ থেকে বিনা অনুমতিতে একটা তুলে নিয়ে ধরিয়ে ফেললেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন- তাহলে পুরনো অভিনেতারা আবেগাশ্রয়ী অভিনয় করতে করতে ডুবে যেতেন পার্টে। তাই সেটা আর্ট?

অভিনেতা বললেন হ্যাঁ। সব আর্টেরই মূল কথা হল আবেগ।

পরিচালক বললেন—ঠিক, সব আর্ট সৃষ্টি করার সময়ে আবেগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু একবার সৃষ্ট হয়ে গেলে তার আর নড়চড় নেই। একটা ছবি আঁকবার সময়ে শিল্পীর মনে বেশ খানিকটা উচ্ছ্বাস আসতে বাধ্য। কিন্তু সে উচ্ছ্বাসকে যখন তিনি রং আর ক্যানভাসে বেঁধে ফেললেন তখন সেটা চিরকালের মতন স্থির হয়ে রইল। রোজ সে ছবি বদলে যেতে পারে না। কারণ রং বা ক্যানভাস প্রাণহীন পদার্থ। ঔপন্যাসিক যখন লেখেন তখন তাঁর প্রাণে আবেগের বন্যা বইতে পারে; কিন্তু সে আবেগের ফলাফল অনড় কাগজ-কালির সীমায় বন্দী হয়ে থাকে। কিন্তু অভিনেতা নিজেই স্রষ্টা, আবার নিজেই সৃষ্টির উপাদান। তিনিই শিল্পী, আবার তিনিই শিল্পের কাগজ-কলম-রং-ক্যানভাস। অথচ তিনি জীবন্ত মানুষ। এবং জীবন্ত বলেই তিনি অনড় নন, সচল। তাঁর হাত-পা, তাঁর কণ্ঠস্বর সচল এবং তিনি মানুষ, মেশিন নন। আর মানুষ বলেই প্রতিদিন তিনি হুবহু একই জিনিষ সৃষ্টি করতে পারেন না। কক্ষনো পারেন না। 'মার্জিন

অফ হিউম্যান এরর' তাঁকে ছাড়তেই হবে। আর ঠিক সেই কারণে তিনি শিল্পী নন, তাঁর আবেগ-ভিত্তিক অভিনয়ও শিল্প নয়। আবেগের উপর যার ভিত্তি তার বিচিত্র গতি। আবেগ যেদিন সপ্তমে উঠলো সেদিন অভিনয় উঁচু পর্দায় বাঁধা; আবেগ যেদিন ঢিমেতালে চলছে, সেদিন অভিনয়ও মন্দ্র সপ্তকে নেমে আসতে বাধ্য। আবেগে যে অভিনেতা কম্পিত তিনি কি সুরে বলবেন, কি ঢং-এ হাঁটবেন কেউ বলে দিতে পারে? তিনি চাইছেন এটা, হচ্ছে ওটা। চাইছেন বসে পড়তে, হচ্ছে ভেঙে পড়া। আবেগ তাঁকে কানে ধরে ঘোড়-দৌড় করাচ্ছে। এমতাবস্থায় শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব। আবেগভিত্তিক শিল্প আকস্মিক জিনিষ। একেক দিন হলো, একেক দিন হলো না। গ্যারিক নিজেই বলছেন যা স্রষ্টার কাছে অজ্ঞাত, অজানিত, তা শিল্প কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এদিকে গর্ডন ক্রেগ স্পষ্টই বলেছেন, "Art.....can admit of no accidents. That then which the actor gives us is not a work of art; it is a series of accidental confessions. আমাদের প্রবীণ অভিনেতাদের ভাষায় 'মুড না হলে অভিনয় হয় না।' কিন্তু মুড তো আমাদের চাকর নয়; সে রোজ 'বন্দা হাজির' বলে নাও হাজির হতে পারে।

অভিনেতা বলে উঠলেন—তা মুড চিত্রশিল্পীরও এক-আধদিন না আসতে পারে। সে দিন তাঁর ছবি খারাপ হয়। যে দিন মুড থাকে সে দিন ভালো ছবি আঁকেন।

এবার দার্শনিক বললেন—আপনি প্রশ্নটা অন্যখানে নিয়ে গেলেন। চিন্তার মুড সম্বন্ধে আমরা কথা বলছি না! চিত্রশিল্পী যদি খারাপ আঁকেন, ছবিটা তিনি ছিঁড়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু যা ভাবছেন ঠিক তাই আঁকতে তিনি সক্ষম। তাঁর আঁকার উপকরণের কোনো নিজস্ব মুড নেই যে তারা হঠাৎ ভিন্ন পথে লম্বা দেবে। তিনি যদি একটা সরল রেখা আঁকতে চান, তো তুলি বা রং-এর এমন ক্ষমতা নেই যে, তারা সেটাকে বৃত্তে পরিণত করতে পারে। কিন্তু অভিনেতা স্রষ্টা হিসেবে যা ভাবছেন, সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে সেটাকে নাও রূপ দিতে পারেন, কারণ

তাঁর হয়তো আজ মুড নেই। অনেক ভেবেচিন্তে অভিনয়ের যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, অসংযত আবেগে বা আবেগের অভাবে, অর্থাৎ মুড-এ থাকলে বা মুড-এ না থাকলে তিনি সে পরিকল্পনা থেকে অনেক দূরে সরে যেতে পারেন। এবং গিয়েও থাকেন এটা আমরা সবাই জানি। অর্থাৎ যেটাকে সরলরেখার মতন এঁকেছিলেন, সেটা বৃত্ত হয়ে দাঁড়াল। এখানেই আসছে আবেগ-ভিত্তিক অভিনয়ের মূলগত বিরোধ। একদিন এক মস্ত অভিনেতাকে দেখেছিলাম বহুদিন আগে সংসারে; সে দিন তাঁর মুড এসেছিল নিশ্চয়ই কারণ সহ অভিনেতাকে হত্যা করার সময়ে তলোয়ার দিয়ে জখম করেছিলেন। আর মুড না থাকলে যে কি হতো তা কয়েক বছর আগেও রবিবার দুপুরের অভিনয় দেখলে বোঝা যেত। 'নন্দকুমার' দেখেছিলাম, মশাই, ওয়োরেন হেস্টিংস এবং নন্দকুমার প্রতি সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে অনুচ্চস্বরে খিস্তি করছিলেন, আঠারো শতকের ভাষায় নয়, খাঁটি বিশ শতকের কলকাতার রকবাজদের ভাষায়।

সবাই একটু ভদ্রতার হাসি হাসলেন। তারপরই অভিনেতা সদর্পে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। বললেন—শিল্পে আকস্মিকতার স্থান নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। বেনেদেত্তো ক্রোচে থেকে আঁদ্রে জিদ পর্যন্ত সকলের মতামত দেখলে ক্রমশই প্রতীত হয় সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টিতে আকস্মিকতার স্থান ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাতীত। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের অন্তত একটি ক্ষেত্রে আকস্মিকতা বিরাট স্থান জুড়ে আছে। সেটাকে এড়াবেন কোন্ যুক্তিতে? আমি বলছি রাগসংগীতের কথা, বিশেষ করে খেয়ালের কথা। এখানেও গায়ক নিজেই স্রষ্টা, নিজেই উপকরণ। কিন্তু ইওরোপের অপেরা-গায়ক অন্যের স্বরলিপি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, প্রতিটি আরিয়া-র প্রতিটি স্বর পূর্বনির্ধারিত। কিন্তু ভারতীয় গায়ক! রাগের লক্ষণ বা সরগম-আদি ছাড়াও তাঁর নিজস্ব স্বাধীনতা আছে। এবং এই স্বাধীনতার জন্যেই আকস্মিকভাবে এক একটা প্যাটার্ন সৃষ্টি হতে বাধ্য। গায়ক নিজেই কি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যান না নতুন প্যাটার্ন সৃষ্টিতে? গায়ক মুড-এ না থাকলে এ ধরণের গান গাওয়া কি সম্ভব? পদে পদে

নতুন প্যাটার্ন স্বষ্টি করা সম্ভব? "মেজাজ" বলে যে কথাটি চালু আছে সংগীতজগতে তার তাৎপর্য ভেবে দেখেছেন আপনারা?

ভাষাবিদ বললেন -- শিল্পসৃষ্টির ভিত্তি আলোচনা করলে আপনার কথা আপেক্ষিক অর্থে সত্য। কিন্তু আপেক্ষিকই, তার বেশি নয়। সব শিল্পেই কিছুটা আকস্মিকতা অনস্বীকার্য। তার মধ্যে ভারতীয় রাগ-সংগীতে আকস্মিকের পরিসর অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু সেইজন্যেই সেটাকে লুপ্ত করে আনার কি প্রয়াস গায়কদের! সেইজন্যেই প্রতিটি তানকে হাজারবার রেয়াজ করার ঐতিহ্য স্থাপিত হয়েছে। সেইজন্যেই ভারতীয় রাগসংগীতের জন্যে যে সাধনা প্রয়োজন তা আর কোনো শিল্পে আছে বলে আমার জানা নেই। এই প্রাণান্ত পরিশ্রমের উদ্দেশ্যই হলো আকস্মিককে ক্ষুদ্রতম পরিসরে বন্দী করে রাখা। বলছেন, পদে পদে এঁরা নতুন প্যাটার্ন স্বষ্টি করেন। বাজে কথা। আপনার তা মনে হয়। আসলে ওসব প্যাটার্ন কয়েক হাজার বার অভ্যেস করে তবে তাঁরা আসরে বসেন, আকস্মিক এখানে কিচ্ছু নেই। তবে কলাকৌশলকে এমনভাবে তাঁরা আয়ত্ত করেন যে, আপনার মনে হয় সহজ সাবলীলভাবে বুঝি তাঁরা তক্ষুণি সুর-স্বষ্টি করছেন। আর আবেগ তাঁদের যতই থাক, রাগসংগীত আবেগ-ভিত্তিক নয়। অসংখ্য নিয়মে খেয়াল-গান বাঁধা। খেয়াল-এ খামখেয়াল নেই, এটা মনে রাখবেন।

পরিচালক বললেন তা ছাড়া অভিনেতার চেয়ে গায়ক আর একটি বিসয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গায়কও শিল্পের উপকরণ বটেন, কিন্তু গায়কের হাতের অস্ত্রটি অসাধারণ। তিনি কথা কন না, গলায় সুর তোলেন: আর রেয়াজি গলায় সুর একটা বিশেষ ঢং, বিশেষ ষ্টাইল নিয়ে বসে যায়। গায়কের মানসিক অবস্থা যাই হোক না কেন, তাঁর গলাটা একই থাকে। যার সি-শার্প, তার সি-শার্পেই সা থাকে। আবেগে অস্থির হয়ে স্কেল নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। এদিক থেকে গায়কের গলাকে একটি সংগীতের যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কারণ এর নিজস্ব

কোনো মুড নেই বা গায়কের মুড দ্বারা এ প্রভাবান্বিত নয়। এর প্রায় আলাদা সত্তা দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু অভিনেতার গলা, তাঁর মানসিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য। কারণ তিনি মঞ্চে কথা বলেন স্বাভাবিক নিজস্ব গলায় এবং ভঙ্গীতে। সেইজন্যেই অভিনেতার গলা ভাঙ্গে, সেইজন্যেই খুব বড় অভিনেতাকেও হঠাৎ শুনতে হয় "লাউডার প্লীজ!" জীবন থেকে সরে গিয়ে নকল একটা জোয়ারি এনে ফেলে গায়ক তাঁর গলাকে স্বাধীন দৃঢ় স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেন; আর জীবনানুগ কথাবার্তা বলতে হয় বলে অভিনেতার গলা আপনার আমার গলার মতনই আবেগের দাস—অভিমানের গলা, দুঃখের গলা, ক্রোধের গলা, স্বাভাবিক গলা প্রভৃতি নানা স্তরে অভিনেতাকে ছুটে বেড়াতে হয়। গায়ক আর অভিনেতাকে এক পর্যায়ে ফেলা ঠিক নয়, যেমন ঠিক নয় সেতার আর অভিনেতাকে এক শ্রেণীতে ফেলা।

অভিনেতা পরাভব স্বীকার করেন না; বলেন—এইসব না হয় মানলাম। তাতে কি হলো? আকস্মিকতাকে একেবারে অস্বীকার তো আপনারা করতে পারছেন না। অভিনয়-শিল্পে না হয় আকস্মিকতার স্থান কতকটা বেশি; অপেক্ষাকৃত বেশি। আবার তাকে আয়ত্তে রাখবার জন্যে অভিনেতার পরিশ্রমই বা কম কিসে? রিহার্সালের উদ্দেশ্যই তো তাই।

পরিচালক বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—ঠিক! রিহার্সালের উদ্দেশ্যই হলো অভিনেতার চলাফেরা কথাবার্তাকে সুদৃঢ় ছকের মধ্যে নিয়ে আসা, যাতে আবেগ-বশবর্তী হয়ে আকস্মিকের উপর তিনি নির্ভর না করেন। কিন্তু এতকাল বাংলা নাট্যশালায় আমরা কি দেখেছি? রিহার্সাল বস্তুটির কি হাল তাঁরা করেছেন?

অভিনেতা চেঁচামেচিতে ঈষৎ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, বললেন—কারা?

পরিচালক উন্মত্ত স্বরে বললেন—অভিনেতা মহারাজরা! উচ্ছৃঙ্খলতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তাঁরা! কজন ঠিক সময়ে রিহার্সালে এসেছেন? কজন রিহার্সালে আদৌ এসেছেন? রিহার্সাল

বলতে এতকাল কি বুঝিয়েছে ? জনাকয়েক লোক পরিচালককে ঘিরে বসেছেন ; বসে বসেই বলে নিয়েছেন পার্টটা। উঠে দাঁড়াবারও দরকার হয়নি ; চলাফেরা, বসা-ওঠা, প্রবেশ-প্রস্থান কিছুই মহড়া দিতে হয়নি। সীন এঁকেছেন যিনি ড্রেস-রিহার্সালের পূর্বে তিনি অভিনেতাদের কখনো জানাননি কি রকম পরিকল্পনা তিনি করছেন।

পরিচালক- পরিচালক তাঁকে বলবো না. বলবো কথা-নির্দেশক…কি ধরণের নির্দেশ দিতেন জানেন ? অভিনেতাদের কথা ঠিক করে দিতে তাঁর পরিশ্রমের শেষ নেই, কিন্তু দৃশ্যসজ্জা-বিষয়ে তাঁর নির্দেশ কি হতো ? ওহে, একটা বনপথ লাগবে প্রথম অংকে ! দ্বিতীয় অংকে দরবারে দুটো থাম দিও তো হে ! আর তৃতীয় দৃশ্যে অন্তঃপুরে একটা তক্তপোষ লাগবে। বাস ! বাদবাকি সব দৃশ্যসজ্জাকরের স্বাধীন কল্পনা-প্রসূত। অভিনেতা হয়তো দরজা কল্পনা করেছেন ডানদিকে, দরজা এল বাঁদিকে। অভিনেতা ভেবেছেন অমুক সংলাপটা বসে বসে দেব, কার্যক্ষেত্রে দেখলেন ভোঁ ভাঁ, বসার কোনো আসনই দৃশ্যসজ্জায় নেই। অতএব, অভিনেতা বাহাদুররা যে যেমন দাঁড়িয়ে প্রাণপণে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে গেছেন ! রিহার্সাল মানে শৃঙ্খলা !! আমাদের বড় বড় অভিনেতাদের কাছে রিহার্সাল ছিল চা-সিঙ্গাড়ার আসর আর প্রক্সি দিয়ে কাজ চালাবার মেলা ! তারপর দুই বড় অভিনেতা এক দৃশ্যে এলেই আমরা কি দেখেছি ? প্যাঁচের লড়াই ! হাততালি কুড়োবার পাঁয়তারা ! পরস্পরকে দাবিয়ে দেয়ার আণবিক যুদ্ধ ! আর কম্বিনেশন নাইটে এক দংগল বড় অভিনেতা জড়ো হওয়ার ফলে যে গৃহযুদ্ধ ঘটতে দেখেছি তাতে দর্শক হিসেবে আমার মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে গেছে। নাটক চুলোয় গেল, দৃশ্যের পরিবেশ জাহান্নমে গেল—চলছে শুধু সাজাহান-আওরংগজেব-যশোবন্ত দিলদারের খেয়োখেয়ি ! এরকম ব্যভিচার করতে করতে তাঁরা দর্শকদের পর্যন্ত এত নীচে টেনে নামিয়েছিলেন যে অভিনেতাদের পারস্পরিক তুলনাই হয়ে উঠেছিল দর্শকদের কাজ ! এঁর শাজাহান ভাল, না ওঁর ! এঁর আওরংগজেব ওঁর দিলদারকে কেমন চেপে দিল,

ওঁর যোগেশ এঁর রমেশকে কেমন জুতিয়ে দিল, ঐসবই ছিল মূল আলোচনার বিষয়! ছ্যা, ছ্যা! স্বর্গ থেকে যে গিরিশ আর দ্বিজেন্দ্রলাল চোখের জলে বান ডাকাচ্ছিলেন একথা এইসব অভিনেতাদের স্ফীত মস্তিষ্কে ঢোকেনি! আর বলিহারি সেইসব পক্বকেশ পণ্ডিতদের যারা এতকাল এই কুৎসিত নির্লজ্জ মারামারির মধ্যে নাট্যশালার সর্বনাশ দেখেননি, দেখছেন আজকে যখন নবনাট্য আন্দোলন অভিনেতার স্বেচ্ছাচার বন্ধ করে সামগ্রিকভাবে মঞ্চটাকে ঐক্যবদ্ধ শিল্পরূপ হিসেবে গড়বার চেষ্টা করছে!

দার্শনিক বললেন—আবেগ-ভিত্তিক অভিনয়ের মূল বিরোধটা তখনই স্পষ্ট হয় যখনই দুই বা ততোধিক আবেগময় অভিনেতা এক দৃশ্যে অভিনয় করেন। এঁর আবেগ আর ওঁর আবেগ দুই ভিন্ন পথে ছুটতে থাকে; তার মধ্যে মিল ঘটাবে কে এমন দূরদৃষ্ট! আর অভিনয় একক শিল্প নয়, বহু-র সমন্বয়। তাই আবেগ-ভিত্তিক অভিনয় সব সময়েই অশৈল্পিক!

অভিনেতা দেখলাম কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তবু বললেন—আপনারা কি বলতে চান প্রাচীনরা রিহার্সালে কিছুই করতেন না?

পরিচালক ধমকে বললেন—হ্যাঁ, তাই বলছি; কিস্সু করতেন না! করলে যে আবেগ খানিকটা সংযত হয়ে পড়বে! সে কি হতে দেয়া যায়? আরে মশাই, পার্টটা পর্যন্ত মুখস্থ করতেন না তাঁরা! আর অংগভঙ্গীরই বা কি বাহার! রিহার্সালে গতর তোলার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অভিনয়ের দিন? পুরো নাটকটা চলছে ঢিমে তেতালায়। হঠাৎ-হঠাৎ মুড এসে পড়তেই গলা সপ্তমে এবং হাত শূন্যে উঠলো! কতকগুলো ফর্মূলা-বাঁধা জেস্‌চার-এরই রকমফের, বেগে প্রস্থান বা বেগে প্রবেশের মুখে একখানা কোমর-দোলানো অংগুলি-নির্দেশ! সে যে কি কদর্য ব্যাপার না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না? এ ছাড়া আরও যে কতকগুলো ভুরু-তোলা বা চোখ-পাকানো বা ক্রূর-হাসির রেওয়াজ আছে সেগুলির অর্থও এখনো আমি বুঝি নি। শেরিডান-এর 'ক্রিটিক' পড়েছেন তো? তাতে রিহার্সালের দৃশ্যে এক অভিনেতাকে বিনা সংলাপে

শুধু একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় নিতে দেখে সমালোচক ড্যাংগল্ বলছেন ঃ

"What does he mean by shaking his head in that manner?"

তাতে পাফ্ বলছেন ঃ

"Don't you know? Why, by that shake of the head he gave you to understand that even though they had more justice in their cause and more wisdom in their measures, yet, if there was not a greater spirit, shown on the part of the people, the country would at last fall a sacrifice to the hostile ambition of the Spanish monarchy."

ড্যাংগল্ হতভম্ব হয়ে বলছেন ঃ

"Did he mean all that by shaking his head?"

এই ছিল আমাদের আবেগাশ্রয়ী অভিনেতাদেরও চেহারা! আবেগ চিরকালই ভাসা-ভাসা, ঘোলাটে আবছা-আবছা বস্তু। তাকে রূপ দিতে গেলে ঐ পাফ্-সাহেবের অভিনেতাদের মতনই আবছা অস্পষ্ট অংগভঙ্গী ছাড়া উপায় কি?

এবার নাট্যকারও দেখলাম তাঁর ডেকে-আনা উকিলের কথাবার্তায় আস্থা হারাচ্ছেন। কারণ তিনি নিজেই জিগোস করে বসলেন—আচ্ছা, আবেগকে মুক্ত বিচরণের অধিকার দিলে আরো একটা সমস্যার উদ্ভব হয় না কি? অভিনেতা নিজে মানুষ, তাই নানা স্বাভাবিক মানবিক আবেগে তিনি নিজেই বিপর্যস্ত। কিন্তু মঞ্চের উপর তাঁর নিজের আবেগের কোনো স্থান নেই; সেখানে আর একটি চরিত্রের আবেগে তাঁকে ডুবতে হবে। কিন্তু আবেগের ছিপি খুলে দিলে আমার তো মনে হয় নিজের আবেগের স্রোতটাই ছুটবে আগে। সব মিলে একটা জগাখিচুড়ি হবার সম্ভাবনা থাকে না? কারণ মানুষ নানা জটিল আবেগের আবর্ত-মাত্র; কিন্তু নাটকের চরিত্র মোটামুটি সরলীকৃত; সিমপ্লিফাইড।

ভাষাবিদ বললেন—পাউল কর্নফেল্ট ঠিক তাই বলেছেন, শুনুন ঃ

"Concern for many things prevents the real-life person from externalising himself completely : the memory of many things rooted in him and the rays of a thousand events criss-cross within him. So at any given moment he can only be a changing complex of behaviour."

কিন্তু অভিনেতাকে মঞ্চের ওপর হতে হবে 'not complex, but one !' অতএব আবেগকে দমন না করে উপায় নেই।

পরিচালক বলে চললেন—তা ছাড়া কার আবেগ ? অভিনেতা, আপনি বলছেন, তাঁর পার্টের মধ্যে ডুবে যেতেন ! কি করে ? কি উপায়ে ? যতক্ষণ কোনো গেরস্ত-গেরস্ত চরিত্র করছি ততক্ষণ বলতে পারি সে চরিত্রের আবেগ হয়তো আমি খানিকটা বুঝতে পারি। ছেলের আমাশা, বাড়ি ভাড়া দেয়া হয়নি, গোয়ালা জল মেশায়, গিন্নী আবার আঁতুর-ঘরে, এসব সমস্যায় জর্জরিত চরিত্রের যা আবেগ তার সংগে আমার নিজের আবেগকে হয়তো মিলিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ধরুন সাজাহান, ভারত-সম্রাট সাজাহান, নিজ প্রাসাদে প্রাণপ্রিয় পুত্র কর্তৃক বন্দী সাজাহান, প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ পিতাশ্রেষ্ঠ সম্রাট সাজাহান ! কে বলতে পারে, হাঁ, আমার আবেগের সংগে সাজাহানের আবেগ মিলতে পারে ? কোথায় সে বস্তুবীজ ? তবে কি সাজাহানের বিপুল হৃদয়াবেগকে খর্ব করে, বাঁধ বেঁধে পূতিগন্ধময় জলাশয়ে পরিণত করে টেনে তাকে নিম্নমধ্যবিত্ত অভিনেতার পর্যায়ে নামাতে হবে ? ছা-পোষা অর্ধশিক্ষিত অভিনেতা শ্রীযুত গোলোকচন্দ্রবাবু সাজাহানের পর্যায়ে উঠতে পারছেন না ; ঠিক আছে, সাজাহানকেই টেনে গোলোকচন্দ্রের পর্যায়ে নামানো যাক !

অভিনেতা অপমানিত আরক্ত মুখে প্রতিবাদ করে উঠলেন—কেন ? গোলোকচন্দ্র যদি ভাল অভিনেতা হন তবে তাঁর কল্পনাশক্তি থাকা উচিত। সাজাহানকে কল্পনা করে নিতে পারেন !

পরিচালক দাবড়ানি দিয়ে উঠলেন—আরে থামুন না মশাই ! কল্পনা-

শক্তির একটা সীমা আছে তো! নাকি! বাহ্যতঃ একটা সাজাহান খাড়া করা কঠিন নয়; পোষাক-টোষাক পরে, মুখে দাড়ি-টাড়ি এঁটে বাদশাহকে নকল করা সম্ভব, এমন কি, ভাল দৃশ্যসজ্জা পেলে দরবারের জাঁকজমকও খানিকটা এনে ফেলা যায়; অনবরত ইতিহাসের বই পড়ে আর দরবারি কানাড়ায় খেয়াল শুনে সম্রাট সাজাহানের মনের দিকটাও অংশতঃ হয়তো মক্‌সো করা যায়। আর আগ্রা গিয়ে চাঁদনি রাতে তাজমহল দেখে বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েও খানিকটা বাদশাহি মেজাজ না হয় আনা গেল। চলনবলনে বেশ একটু রাজসিক ভাব না হয় রপ্ত করা গেল। কিন্তু সে তো আর আবেগের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সম্রাটের আবেগ কেমন ছিল সে-অবস্থায়, সেটা যিনি কল্পনা করতে পারবেন তিনি যে দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ হয়ে পড়বেন! শেক্‌স্‌পিয়ারের ওথেলো যখন অজ্ঞান হয়ে মঞ্চে পড়ে যায়, তারপর উঠে ভুল বকে, বা হ্যামলেট যখন পোলোনিয়াসকে হত্যা করে, তখনকার আবেগ কেমন যদি জানতে পারতাম তবে আমিই শেক্‌স্‌পিয়ার হয়ে বসতাম!

অভিনেতা বললেন—কেন? দ্বিজেন্দ্রলাল আর শেক্‌স্‌পিয়ার-এর লেখায় সে আবেগ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। পড়লেই বোঝা যায়।

পরিচালক বললেন—ওঁদের লেখায় যে আঁচটুকু পাওয়া যায় তার ওপর ভিত্তি করে সে চরিত্রের বৃহত্তর আবেগে প্রবেশ করতে পারেন? ঐটুকু পরিবেশে গোটা মানুষটাকে ধরতে পারেন?

নাট্যকার আর থাকতে পারলেন না, বলে উঠলেন—অসম্ভব! বড় বড় পণ্ডিতরা সম্যক বুঝতে পারেন না ঐসব মহাশক্তিধর চরিত্রদের, আর অভিনেতা বুঝবেন কি করে? নাট্যকার ঠিক কি ভেবে লিখেছিলেন তা যথাযথ বোঝা অসম্ভব। একটা ছবি দেখে পিকাসো-র আবেগকে সম্যক বুঝতে যাওয়া মূর্খতা। দরবারি আলাপ শুনে তানসেনের আবেগকে চিনতে ভগবানও পারেন না। কেন বাজে কথা বলছেন?

অভিনেতা দমেন না; বলে চলেন—প্রশ্নটা গুলিয়ে ফেলছেন। সম্যক আবেগ ধরতে পেরেছি কিনা সেটা বড় কথা নয়; কথা হলো

দর্শক ,আমাকে দেখে সাজাহান বলে মেনে নিচ্ছে কিনা। অভিনয়-শিল্পের বৈশিষ্ট্যই হল দর্শকের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি।

চেঁচিয়ে উঠলেন পরিচালক—একস্যাক্টলি! দর্শককে ধোঁকা দিতে পারলেই হল। তবে আবেগের কথা কেন তুলছেন? দর্শকের অবিশ্বাসকে স্তম্ভিত করে নাকচ করে দিতে পারলেই হল। সেখানে আবেগের স্থান কোথায়? বিন্দুমাত্র আবেগ আমার মধ্যে না জাগলেও আমি ঠাণ্ডা মাথায় আমার চলাফেরা, কথাবার্তা, পোষাক-রূপসজ্জা সব দিয়ে দর্শককে বুঝিয়ে ছাড়তে পারি যে, আমি সাজাহান।

অভিনেতা আমতা-আমতা করছিলেন। তাই পরিচালক উন্মত্ত রিহার্সালি কণ্ঠে ধমক দিলেন—বলুন, পারি?

অভিনেতা বললেন, শুষ্ককণ্ঠে,—হ্যাঁ।

পরিচালক জেরা করে চললেন—এবং এই ধোঁকাবাজিই যেখানে অভিনয় শিল্পের ভিত্তি, সেখানে ঠাণ্ডা মাথাই বেশি কাজকরী, এটা মানেন? আবেগে অস্থির হলে ধোঁকাবাজি করা যায় না, এটা স্বীকার করেন? আবেগ-ভিত্তিক অভিনয়ের অর্থই হল নিজের ধোঁকায় নিজেই পর্যুদস্ত হওয়া, এটা মানেন?

অভিনেতা মৃদু মাথা নাড়লেন। পরিচালক সদর্পে বলে চললেন—দর্শককে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়া যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে নিজেরই আবেগে বিচলিত হওয়া হল মূর্খতার রেকর্ড! আর ওদিকে শিশিরবাবুর জীবানন্দ নিরুত্তাপ উদাসীন ভাবলেশহীন কণ্ঠে দুটি কথা কইল, আর মুহূর্তে প্রেক্ষাগৃহে আমাদের চোখ জ্বালা করে উঠল! বলুন, অভিনয়ের উদ্দেশ্য কে সত্যি সাধিত করলেন! আপনি ছবিবাবু, অহীনবাবুর নাম করেছেন, কিন্তু নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর নাম সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। কেন গেছেন জানি। বাংলার নাট্যশালার মরুভূমিতে শিশিরবাবু একমাত্র ওয়েসিস। আবেগে অস্থির হয়ে তাঁকে কোনোদিন চেঁচাতেও দেখিনি, ডুকরে কাঁদতেও দেখিনি, লম্ফঝম্ফও করতে দেখিনি, ফোকাশ নিতেও দেখিনি। ধীর স্থির মানুষটি মঞ্চের কোণে বসে মৃদু হেসে চলে গেছেন।

প্রতি মুহূর্তে নিজের ওপর রেখেছেন সতর্ক পাহারা। সেই সঙ্গে রেখেছেন দর্শকের উপর সজাগ দৃষ্টি। অথচ দর্শককে কাঁদিয়েছেন আর হাসিয়েছেন বছরের পর বছর। মশাই, শিশিরবাবুর কাছ থেকে শিখুন, কাকে বলে বুদ্ধি-আশ্রিত অভিনয়, কাকে বলে অভিনয়। নিজে তিনি আবেগে ভেসে যান নি, দর্শককে আবেগে ভাসিয়েছেন। অভিনয়ের উদ্দেশ্য নিজে কাঁদা নয়, দর্শককে কাঁদানো। অভিনয়ের উদ্দেশ্য নিজেই হেসে ফেলা নয়, দর্শককে হাসানো। আবেগাশ্রিত অভিনয় কক্ষনো এ উদ্দেশ্য সফল করতে পারে না।

অভিনেতা কিয়ৎকাল মাথা ঝুঁকিয়ে ভগ্ন দেবদাসের মত বসে রইলেন। তারপর একখানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—কিন্তু নটগুরু স্তানিস্‌লাভস্কি পর্যন্ত অভিনয়ে মুহূর্তের আকস্মিক প্রেরণাকে স্বীকার করেন। তাঁর যে ঠাণ্ডা মাথায় পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিনয়-পরিকল্পনা তার উদ্দেশ্য আবেগকে নিয়মিত জাগাবার একটা রাস্তা বার করা। তিনি বলছেন তাঁর সিস্টেম্ আবিষ্কারের মূলে ছিল এই প্রশ্নটি ঃ

"Are there no technical means for the creation of the mood, so that inspiration may appear oftener than is its wont ?"

অর্থাৎ আবেগ বা প্রেরণাকে বাদ দেয়ার কথাই উঠছে না। বরং সেই আবেগকে ইচ্ছেমত জাগানো যায় কি না।

পরিচালক বললেন—তা স্তানিস্‌লাভস্কিকেই বা চরম বিচারকের আসনে বসাবো কেন? স্তানিস্‌লাভস্কি কোনো সিস্টেম আবিষ্কার করেননি। আবিষ্কার বলতে যা বোঝায় তা করেননি। তাঁর পূর্বসূরীদের ধ্যান-ধারণাগুলোকে তিনি একটা বৈজ্ঞানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পূর্বসূরীরা এবং তিনি নিজেও আবেগাশ্রিত অভিনয়ে বিশ্বাসী। তাঁর মতকে আমরা মানতে যাব কেন? বিশেষ যখন তাঁর সিস্টেম একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

অভিনেতা চমকে উঠলেন—কি! ব্যর্থতায়! মানে?

পরিচালক বললেন—ব্যর্থ না হলে তাঁর সিস্টেম অনুসরণ করলেই

প্রেরণা জাগবার কথা! অথচ মস্কো আর্ট থিয়েটারের বর্তমান পরিচালক-দের এবং অভিনেতাদের মন্তব্য পড়ুন; বুঝবেন অমন সুইচ-টেপা প্রেরণার উৎস তাঁদের হাতে নেই। স্তানিস্লাভস্কিরই আখড়া থেকে আবেগের চরম শত্রু মোয়ারহোল্ডের আবির্ভাবেই বোঝা গিয়েছিল সিস্টেম-টির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

অভিনেতা চেঁচিয়ে উঠলেন—কেন একথা বলছেন? কি সাহসে? কি স্পর্ধায়?

পরিচালক বললেন—বলছি, বলছি। সিস্টেমটির মূল কথা কি? না, ওসব ইনার সার্কল বা সাইকোটেক্নীক-এর কচকচি বাদ দিয়ে মোদ্দা কথায় আসুন!

অভিনেতা বললেন উদ্দীপ্ত হয়ে—স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতির মূল কথা হল—দি ম্যাজিক ইফ্। অভিনেতা জানেন তাঁর আশেপাশের দৃশ্য-পটগুলো সত্যিই ইটের দেয়াল নয়; তিনি জানেন তিনি সত্যিই গোর্কি-সৃষ্ট মাতাল সাটিন নন; তিনি জানেন আশেপাশের চরিত্ররা সত্যিই চোর-গুণ্ডা-মাতাল নয়; তিনি জানেন পুরো ব্যাপারটা অলীক। তবু তাঁকে ভাবতে হবে: "যদি এসব সত্যিই হত তবে আমি কি করতাম?" ঐ যদিটাকে প্রাণপণে ধ্যান করতে পারলেই মুড আসবে, আবেগ জাগবে।

পরিচালক শ্লেষাত্মক হাসি হাসলেন; বললেন—যদি এসব সত্যি হত!! কি করে সত্যি হবে? আমি কি মাতাল, না পাগল! অভিনেতার মাথা খারাপ না হলে ঐ যদিটাকে বিশ্বাস করবেন কি করে? আমি তো জানি এসব মিথ্যে। সেখানে ওসব যদি-টদি আমদানীর অর্থই হল—সত্যের ভান! ভান কখনো শিল্প হতে পারে না। দর্শককে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে যদি নিজের কাছেও ভান করতে হয়, তবে মশাই শিল্পকে জলাঞ্জলি দিন, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি! মঞ্চের পুরো জিনিসটাই অবাস্তব! দেয়াল অবাস্তব, চরিত্ররা অবাস্তব, গল্পটা অবাস্তব। ঘরের তিনটে দেয়াল, চতুর্থটা নেই; থাকলে দর্শকরা

কিন্তু দেখতেই পেতেন না। মাথার উপর ছাদ নেই, আছে কাপড়ের বর্ডার। দেয়ালের পাশেই আছে কালো কালো উইংস্। মাঝে মাঝে যবনিকা এসে পড়েছে। আমি জানি এসব মিথ্যে। এগুলোকে সত্যি ভেবে এগনোর মানে হল শিল্প নিজেকেই নিজে ভাঁওতা দিচ্ছে। আরো শুনুন মশাই, বাধা দেবেন না! স্তানিস্লাভস্কি থেকে শুরু করে এদেশের একক অভিনেতারা পর্যন্ত সকলেই শত মুড সত্ত্বেও কতকগুলো মৌলিক নিয়ম মানছেন, যে নিয়মগুলোর প্রতি মুহূর্তে তাঁদের চলাফেরা কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এক অভিনেতা আরেকজনকে ঢেকে দাঁড়াবেন নাঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো দর্শকের দিকে পেছন ফিরে বলবেন না; গলা তুলে অভিনয় করতে হবে, নিভৃত প্রেমের দৃশ্যেও ষাঁড়ের মতন চেঁচাতে হবে, প্রেমাবেগে গাঢ় গলা করলে চলবে না; ইচ্ছেমত লাইন জুড়ে দেবেন না, তাহলে সহ-অভিনেতাকে আর সংলাপ ধরতে হবে না, উনি মূর্ছা যাবেন!! এরকম বহু নিয়ম তাঁরা মানছেন। এই নিয়ম-গুলোকে স্বীকার করেও আবেগকে কি করে মুক্ত করেন তাই আমার কাছে এক বিস্ময়! আসলে হয়তো এদ্দিন যাকে আবেগ বলে তাঁরা চালিয়ে এসেছেন তা নিছক তাঁদের উচ্ছৃঙ্খলতার অপব্যাখ্যা, এপোলজি। নইলে এঁরা মৃত্যু দৃশ্যে মরার আবেগ আনতে গিয়ে তারস্বরে চারপাতা সংলাপ বলেন কি করে? এক টাকার সীটকে প্রেমালাপ শোনান কি করে? শত্রু শিবিরে ঢুকে ফিস্‌ফিস ষড়যন্ত্রকেও অমন উচ্চগ্রামে ছাড়েন কি করে? তলোয়ারের রাম-খোঁচা খেয়েও অমন ভরত-নাট্যমের ভংগীতে পতন-ও-মৃত্যু দেখিয়ে হাততালি জাগান কি করে? আবেগই যদি এদের প্রধান আশ্রয় হত তবে 'দর্শক চুলোয় যাক' বলে এরা নিজের মনে নির্জনে স্বর্গ রচনা করতেন। না! ঐ "আবেগ" কথাটিও বাংলা নাট্য-শালার উচ্ছৃঙ্খল অভিনেতাদের একট ধাপ্পা! আপনি ডেভিড গ্যারিকের উধৃতি দিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছেন; প্রায় দুশো বছর আগেকার এক অতি-অভিনয়ের প্রবক্তাকে সাক্ষী মেনেছেন। আমি অসংখ্য নজীর দিতে পারি পরবর্তী প্রতিভাবান অভিনেতাদের মধ্যে থেকে। এঁরা

কেউই আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-টত্ত্ব জানতেন না ; এ'রা প্রত্যেকেই একক অভিনয়ে দিগ্বিজয় করেছিলেন এবং এঁদের আবেগাশ্রয়ী আখ্যাই দিয়ে গেছেন। অথচ এঁরা প্রত্যেকে বলছেন এঁদের অভিনয়ে আবেগ বা প্রেরণার চেয়ে সচেতন পরিকল্পনার প্রভাব অনেক বেশি। গ্যারিক-এরও আগে যিনি ইংলণ্ডের নটগুরু বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন সেই বেটারটন বলছেন :

"Art must be consulted in the study of the larger share of the professors of this art."

তারপর তিনি বর্ণনা করছেন কিভাবে ভেবে ভেবে তিনি চরিত্রের বাহ্য চেহারাটা গড়ে তোলেন ; আবেগ-আদির উল্লেখমাত্র বেটারটন করেন নি। মহাপণ্ডিত দার্শনিক দিদেরো তৎকালীন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ক্লোরেঁা-র অভিনয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন :

"When by dint of work she has got as near as she can to her idea of the part, *the thing is done* ; to preersve the same nearness is a mere matter of memory and practice............She repeats her efforts without emotion."

আর মাদাম ক্লোরেঁা স্বয়ং তো সদর্পে বলে গেছেন—হ্যাঁ, আমি কলাকৌশল দিয়েই গড়ে তুলি আমার পার্ট ; ঐ ভাবেই আমি রোক্সান বা আমেনেজ-এর মতন পার্ট করে আপনাদের কাঁদিয়েছি ! গ্যারিক-বেটারটনের সঙ্গে আর যে লোকটি এককালে ইংল্যাণ্ডের মঞ্চ কাঁপিয়েছিলেন সেই এডমণ্ড কীন সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে ; তিনি নাকি এমন প্রচণ্ড আবেগময় অভিনয় করতেন যে ভয়ে সহ-অভিনেত্রীর মূর্ছা যাওয়াটা নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই কীন বলছেন :

"I have bestowed the utmost care and attention,...There is no such thing as impulsive acting ; all is premeditated and studied beforehand."

উনিশ শতকের দিকপাল ইংরেজ অভিনেতা ম্যাকরেডি বলছেন, 'আবেগকে দমন না করলে পরিকল্পনা থেকে সরে যাওয়া হবে ; অথচ :

"As there must be one form of expression which he finds nearest to the exact truth, in once attaining this, every deviation or declension from it must be more or less a deterioration."

তাই তিনি নবীন অভিনেতাদের আসনে একটি ল্যাটিন আপ্তবাক্য রেখেছেন : হিক্‌লাবর, হক্ ওপুস এস্ত" যার অর্থ মোটামুটি দাঁড়ায় "কাজ করে যাও !" কাজ অর্থে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা। আবেগ বা প্রেরণার মুখ চেয়ে বসে থাকার প্রয়োজন নেই। গত সপ্তকের শ্রেষ্ঠ সমালোচক জর্জ হেনরি লুইস বলছেন :

"What is called inspiration is the mere haphazard of carelessness or incompetence."

হেনরি আর্ভিং-এর চেয়ে বড় অভিনেতা পুরাতনদের মধ্যে বোধ হয় কেউ ছিলেন না। তাঁর অভিনয়কেও আবেগ-কম্পিত বলে সবাই বর্ণনা করতেন। আর্ভিং জবাব দিচ্ছেন :

"It is often supposed that great actors trust to the inspiration of the moment. **Nothing can be more erroneous**.........The great actor's surprises are generally well weighed, studied and balanced."

নাট্যশালার সংগ্রামী বিপ্লবী গর্ডন ক্রেগ্ আবেগকে একেবারে বহিষ্কার করার পক্ষপাতী। তিনি বলছেন :

"As the mind becomes the slave of the emotion it follows that accident upon accident must be continually occurring...... Emotion is the cause which first of all creates, and secondly destroys. Art can admit of no accidents."

এবার দেখা যাক সেই সব আধুনিক অভিনেতাদের যাঁরা "আবেগবান" হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁরা নিজেদের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কি বলছেন? জন্ গীলগুড তাঁর বিখ্যাত হ্যামলেট সম্বন্ধে কি বলছেন, পড়েছেন? গভীর মনোযোগ দিয়ে পূর্ব-নির্ধারিত ছক অনুসরণ করে যাওয়াই তাঁর

একমাত্র কাজ ; আর এক-আধদিন যখন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন—ধরুন দর্শকদের গণ্ডগোলের ফলে বা নেপথ্যে কুশলীদের খটাখটির ফলে—তখন নিজের অজান্তেই তাঁর দেহ এবং কণ্ঠ নিজ নিজ কর্তব্য করে গেছে, দর্শকরা কেউ জানতেই পারে নি যে, হ্যামলেট আজ অমুক দৃশ্যে ভাবছিল শো-এর শেষে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কি না। আবেগের নিকুচি করেছে। গীলগুড-এর চেয়ে বড় অভিনেতা তো মশাই এ শতাব্দীতে দুর্লভ। আমেরিকার নতুন থিয়েটারের জনক ডেভিড বেলাস্কো অভিনয়কে শিল্প বলেও মানতে রাজী নন ; তিনি বলছেন অভিনয় একটা বিজ্ঞান। জন ব্যারিমুর বলছেন অভিনয়ে টেকনিকটাই বড় কথা, আবেগ-টাবেগ বাজে কথা। স্টেলা আডলের বলছেন আমেরিকার গ্রুপ থিয়েটারের ভিত্তিই ছিল দলগত অভিনয় : আর দলগত মানেই ঠাণ্ডা-মাথায় চিন্তা করে অভিনয়। চ্যাপলিন বলছেন, কৌতুকাভিনেতার প্রতি মুহূর্তে দর্শক-সচেতন থাকা চাই ; কৌতুকাভিনয়ের ইতিহাস পড়া থাকা চাই ; এক একটা ক্ষুদ্র দৃশ্যাংশকে পঞ্চাশবার রিহার্সাল দেয়া চাই। আর ব্রেশট্ তো তাঁর নতুন পদ্ধতিতে অভিনেতাকে একেবারে আবেগশূন্য করতে চেয়েছিলেন ; তাঁর এই পদ্ধতির নাম "ফেরফ্রেম্‌ডুং"। তাঁর এপিক থিয়েটারের পরীক্ষা সাফল্যের পথে এ কথাও আজ সর্বজনবিদিত। তিনি চাইছেন "এলিয়েনেশন" ; ঘটনা এবং পরিবেশ থেকে অভিনেতার দূরত্ব বজায় রেখে অভিনয় করা। অভিনেতার কাছ থেকে তিনি চাইছেন বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিকের নিরুত্তাপ দৃষ্টিভঙ্গী। তার জন্যে প্রথমেই আবেগ-আদিকে ছাঁটাই করতে হবে :

If the A-effect এলিয়েনেশন বা ফেরফ্রেম্‌ডুং is to achieve its aim, e stage and the auditorium must be cleared of 'magic'...... The actor is not to warm the audience up by unloosing a flood of temperament."

এরভিন পিস্‌কাটর সোজাসুজি এই এপিক অভিনয়ের নাম দিয়েছেন "অবজেকটিভ একটিং," অভিনেতা যেখানে সূত্রধার মাত্র, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী

সাক্ষীর মতন। অভিনেতার "আবেগ" বা "পার্টে ডুবে যাওয়া" ইত্যাদি শিকেয় তুলে রাখার প্রস্তাব করেছেন পিসকাটর। তাই মশাই, যদ্দুর মনে হচ্ছে স্তানিস্লাভস্কির থিয়োরিটা নেহাৎই ফাঁকা বুলির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আর যে অভিনেতা বলেন, "আজকে পার্ট করতে করতে জগৎ ভুলে গিয়েছিলাম", হয় তিনি মিথ্যাবাদী, আর না হয় ভুলেছিলেন তিনি ঠিকই, তবে সেটা মদ্যপ্রসাদাৎ!

কিছুক্ষণ চারদিক থমথম করছিল। একটু পরে ভাষাবিদ বললেন—হ্যাঁ, আর্ভিং-বেটারটন-ম্যাকরেডি-কীন, তারপর গীলগুড-ব্যারিমুর-চ্যাপলিন-দের মতামত শুনে আমারো মনে হচ্ছে আবেগের স্থান অভিনয়ে নামমাত্র বা নেই!

পরিচালক মাথার ঘাম মুছে বললেন—আর নেই বলেই নবনাট্য আন্দোলন অভিনয় নিয়ে নূতন পরীক্ষার দিকে পা বাড়াতে সাহস করেছে। নূতন অভিনয়, দলগত অভিনয়। ঠাণ্ডা মাথায় নিরুত্তাপ চিত্তে মঞ্চে না নামলে দলের মধ্যে নিজের স্থান গ্রহণ করা অসম্ভব। প্রতি মুহূর্তে যেখানে সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে আদান-প্রদানের প্রশ্ন, প্রতি মুহূর্তে যেখানে বৃহত্তর কম্পোজিশনে নিজের স্থান নেয়ার প্রশ্ন সেখানে ঐ আবেগই হচ্ছে এনিমি নাম্বার ওয়ান! নবনাট্য আন্দোলনে তাই মহারাজ শ্রীল শ্রীযুত অভিনেতা বাহাদুরের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে; পরিচালকই এখানে সম্রাট। তাঁর প্রজা হচ্ছে অভিনেতা। অভিনয় চারটি আঙ্গিকের একটি মাত্র। অভিনেতাকে তাই সম্পূর্ণ নূতন চেতনা নিয়ে পরিচালকের বিশাল নক্সায় নিজের স্থান নিতে হবে। তার জন্যে রিহার্সাল নূতন ধরণের হচ্ছে, অভিনয়ও—যাক, সে আর-একদিন হবে। পরিচালনা সম্বন্ধে যে দিন আলোচনা হবে সে দিন বলবো।

এই সময়ে কেষ্ট প্রচুর জলখাবার নিয়ে প্রবেশ করাতে আলোচনায় ছেদ পড়ল। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

বাস্তব ও বাস্তবোত্তর

সে দিন আলোচনার মধ্যমণি হলেন দার্শনিক। পরিচালক শুধু খেতে লাগলেন, বড় একটা কথা বললেন না। এ দিকে দার্শনিক বললেন—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হিল নামক এক ভদ্রলোক ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে বসলেন। আর যাবে কোথায়? প্রকৃতিকে যে যথাযথ ধরে রাখা যায় এটা জানতে পেরে একদল মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বাস্তবকে অনুকরণ করা শুরু হল। আমি বলতে চাই এই বাস্তববাদীরা সাহিত্যে, চিত্রকলায়, নাট্যশালায়, সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে পদ্মবনে মত্তহস্তীর মতন শিল্পকলার সর্বনাশ করেছেন। আবার অচিরেই চিত্রকলায়, সাহিত্যে বাস্তববাদের বিরুদ্ধে রীতিমত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়ে গেছে; বাস্তববাদ ওখানে গতাসু। কিন্তু নাট্যশালায় তো কই বাস্তববাদীদের পিছু হঠতে দেখছি না। স্যার গর্ডন ক্রেগকে পাগল আখ্যা দিয়ে নাট্যশালা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে; রবার্ট এড্‌মণ্ড জোন্‌স্‌ হতাশ হয়ে থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন; জার্মান এক্‌স্‌প্রেশনিস্টরা আজ নির্বোধ অভিনেতার উপহাসের পাত্র; মায়ারহোল্ড-এর থিয়েটার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল; টলের আত্মহত্যা করেছিলেন; ভাখ্‌টাংগভ্‌ অকালে মরে গেলেন; একমাত্র ব্রেশ্‌ট্‌-এর থিয়েটার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাহায্য পেয়ে টিঁকে আছে; আর যে দিকে তাকাই, দেখতে পাই নাট্যশালায় বাস্তববাদীদের অপ্রতিহত ক্ষমতা। এর কারণ কি?

অভিনেতা বললেন—কারণ জানি না, তবে বাস্তববাদীদের হাতে আছে বলেই এখনো থিয়েটার সহজবোধ্য। নইলে হিজিবিজি পিকাসোর ছবির মতন দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠত।

ভাষাবিদ বললেন—পিকাসো-র ছবিকে হিজিবিজি আখ্যা দিয়ে নিজের অজ্ঞতাই প্রকাশ করছেন।

অভিনেতা সখেদে বললেন—ভাগ্যে আমি পিকাসোকে বুঝতে পারি না।

দার্শনিক বললেন—সেটা আপনার লজ্জা, গর্ব নয়। ও নিয়ে বড়াই করবেন না। প্রশ্ন হচ্ছে থিয়েটার বাস্তববাদের ধ্যানে মগ্ন; এই বাস্তববাদ কি আর্টের পর্যায়ে পড়ে ?

অভিনেতা বললেন—হ্যাঁ, পড়ে। জীবনকে যথাযথ তুলে ধরাই হল আর্ট।

দার্শনিক বললেন—জীবনকে যথাযথ তুলে ধরা কি সম্ভব ? জীবন তো শুধু ঘটনাস্রোত নয়! জীবন বলতে একটা যুগের চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণা স্বপ্নসাধনা সব। তাকে দু ঘণ্টা অভিনয়ের সীমায় বাঁধবেন কি করে ? কালস্থানের সীমায় বাঁধলেই জীবন যে খণ্ডিত হয়ে পড়ছে সে খেয়াল আছে ?

এবার নাট্যকার কঠোর আত্মসমালোচনা শুরু করলেন—তাছাড়া জীবনে কি গল্প থাকে? আমরা যে গল্পের কাঠামো তৈরি করে নিই জীবনে তার অস্তিত্ব কোথায় ? জীবনে কি নায়ক-নায়িকা থাকে ? জীবনে কি ভিলেন থাকে ? যে মুহূর্তে নাটকে গুছিয়ে গল্প সাজাই, যে মুহূর্তে নাটকের চরিত্ররা বিশেষ এক টাইপ ধরে, সেই মুহূর্তে আমরা জীবন থেকে দূরে সরে গেছি। তার পরে বাস্তবের কথা বলা বা বাস্তবের ভান করা নিতান্ত মূর্খতা।

দার্শনিক বললেন— ঠিক। তবু দেখেছি নাট্যশালার শিল্পীরা কিছুতেই বাস্তবতার মোহ কাটাতে পারছেন না।

অভিনেতা উগ্রস্বরে জবাব দিলেন—বাস্তবতার মোহটা খারাপ কিসে এটাই জানতে চাইছিলাম। আপনারা যা বলছেন তা হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল ধাপ্পা। যা দেখছি, যে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করছি, সে বস্তুর আলাদা নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। 'শিল্পী তাকে যে চোখে দেখছেন তার চেয়ে বড় সত্য হল বস্তুর অবজেকটিভ অস্তিত্ব। তাকে আমার কল্পনার রঙে রাঙিয়ে উপস্থিত করলে তবে সে আর্ট হবে?

এ যে বিজ্ঞান-বিরোধী কথাবার্তা। বস্তুর অস্তিত্ব স্বতন্ত্র, মনুষ্য-নিরপেক্ষ। তাকে যথাযথ তুলে ধরাই হচ্ছে প্রকৃত বস্তুবাদীর কাজ। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা বস্তুকে বুঝতে পারি; সেটাই হওয়া উচিত চরম বিচার—ইন্দ্রিয়ের বিচার। তার ওপর যদি বিমূর্ত চিন্তার ছায়া পড়ে তবে তা হল মেটাফিজিক্যাল ধাপ্পাবাজী।

দার্শনিক মৃদু হাসলেন; তারপর বললেন—আপনি মার্কস্‌বাদ বা মেটিরিয়েলিস্টদের যা বুঝেছেন তা আপনিই জানেন! আলবের্ট আইনস্টাইনকে তো বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিতে বাধা নেই?

অভিনেতা বললেন—না, নেই।

দার্শনিক বললেন—সেই আইনস্টাইন আপনার এবং সাধারণ অজ্ঞ মানুষদের 'naive realism' সম্পর্কে বলছেন:

"According to it things 'are' as they are perceived by us through our senses. This illusion dominates the daily life of men and animals; it is also the point of departure in all of the sciences, especially of the natural sciences." অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা দেখছি-বুঝছি তাই চরম—এটা হল সাধারণ মানুষের একটা ভ্রান্ত ধারণা। বিজ্ঞান ঠিক উল্টো কথা বলছে।

ভাষাবিদ বললেন—হ্যাঁ, ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব অতি-সরল বস্তুবাদকে তিনি বলেছেন: প্লেবেইশে ইলিউসিওন ডেস নাইভেন রেয়ালিস্‌মুস্‌। এই বোকচন্দ্র-বস্তুবাদ ও মার্কস্‌-এর ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদে কোনো সাদৃশ্য নেই।

দার্শনিক বলে চললেন—বারট্রাণ্ড রাসেল আরো স্পষ্ট করে বলেছেন:

"We think that grass is green, that stones are hard, and that snow is cold. But physics assures us that the greenness of grass, the hardness of stones, and the coldness of snow, are not the greenness, hardness and coldness that we know in our own experience, but something

very different. The observer, when he seems to himself to be observing a stone is really, if physics is to be believed, observing the effects of the stone upon himself." অর্থাৎ আপনারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দোহাই দিয়ে বাস্তববাদের সাধনা করছেন। সেই বিজ্ঞানই কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান বলছে, যা দেখছ তা কিন্তু সত্যিই তা নয়। দেখার ফলে তোমার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া ঘটছে সেটাকেই তুমি চরম ভেবে বসে আছ। অতএব বস্তুকে স্বতন্ত্র ভেবে লাভ নেই; সে আমাদের মনের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। অতএব আজ পিকাসোরা যখন বাস্তবকে আঁকতে গিয়ে নিজেদের মনের উচ্ছ্বাসটাকেও তার মধ্যে ঢেলে দেন তখন তাকে হিজিবিজি না বলে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হিসেবে স্বীকার করুন।

নাট্যকারও এই সময়ে আর-এক প্রমাণ দাখিল করলেন—শুধু বিজ্ঞান নয়, মনস্তত্ত্বও আধুনিক চিত্রকরদের পক্ষে রায় দিয়েছে। গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থুলেস কতকগুলি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন; নানা আকারের, নানা ঔজ্জ্বল্যের, নানা বর্ণের কতকগুলি অপরিচিত বস্তুকে আঁকতে বলা হয় কয়েকজন শিল্পীকে। শিল্পীরা যা আঁকলেন তার কোনোটাই অভীষ্ট বস্তুগুলির সঙ্গে মিলল না। বাস্তব থেকে শিল্পীরা এই যে সরে এলেন ডাঃ থুলেস এই পার্থক্যের নাম দিয়েছেন ফেনোমেনাল রিগ্রেশন। বস্তুগুলি শিল্পীদের অপরিচিত ছিল; তাই সঠিক আঁকতে চেষ্টা করে এঁরা শুধু যা দেখেছেন তাই এঁকেছেন; এবং যা দেখেছেন তা বাস্তব থেকে বেশ খানিকটা পৃথক। বস্তুগুলি যদি চেয়ার-টেবিল-জাতীয় দৈনন্দিন পরিচিত আসবাব হত তবে ফেনোমেনাল রিগ্রেশন অনেক কম হত, কারণ যা দেখছি তাকে পরিপূরণ করত যা জানি; চেয়ারের আকার আমার জানা, তাই চেয়ারের খানিকটা দেখেই বাকিটুকু নিজের অজান্তেই পূরণ করে এঁকে দিতাম। কিন্তু অপরিচিত বস্তুকে দূর থেকে খানিক দেখে যা আঁকলাম, তাতে একান্তভাবেই আমার চোখের পরীক্ষা হল।

মানুষ আসলে কি দেখে, সেটাই আবিষ্কার করে বসেছেন ডাক্তার থুলেস ; জ্ঞান বাদ দিয়ে, অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে, পূর্বে আহরিত তথ্য বাদ দিয়ে, কল্পনা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র চোখের উপর নির্ভর করলে আমরা যা দেখি তাতে বাস্তবের সঙ্গে ঘোর পার্থক্য দেখা দিচ্ছে। আরো আশ্চর্য ব্যাপার বিখ্যাত কিছু আধুনিক ছবি পরীক্ষা করে থুলেস বলেছেন, এখানেও দেখছি সেই রিগ্রেশন ; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পীরা যতটা সরে এসেছেন বাস্তব থেকে ঠিক ততটুকুই সরেছেন বড় বড় শিল্পীরা ; তবে এঁরা সরেছেন সজ্ঞানে। বস্তুটা কি জেনেও সেই জ্ঞাত তথ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র চোখ যা দেখছে তাই এঁকেছেন। ডাক্তার থুলেস-এর পরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে আধুনিক শিল্পীরা যে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে বস্তুকে আঁকছেন সেটাই হল আসল বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা, কারণ আসলে আমরা বাঁকাচোরাই দেখি। অতএব যাঁরা বাস্তবতার নাম করে প্রকৃতিকে অনুকরণ করেন তাঁরাই অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় দেখা-জিনিষের উপর রং চড়িয়ে তাকে জানা-জিনিসে পরিণত করেন। যাকে বাঁকা দেখতে তাকে সোজা দেখাতে চেষ্টা করেন। যেটাকে অসম্পূর্ণ দেখাচ্ছে সেটাকে নিটোল সম্পূর্ণ করে উপস্থিত করেন। বাস্তববাদীরা আসলে অবাস্তববাদী। তাঁরা আসলে সেই প্রাচীন গ্রীক হার্মোনিবাদীদের নন্দনতত্ত্বের পুনরাবৃত্তি করছেন। সেই যে পাইথাগোরাস-এর শিল্পাদর্শ, যার চরম প্রকাশ এরিস্টট্ল্, এবং যার প্রভাব সেণ্ট্ টমাস একোয়াইনাস-এর উপর প্রবল। সব জিনিসকে পূর্ণ, নিটোল, সুন্দর করে দেখাবার ইচ্ছে। হার্মোনি, অর্ডার, সিমেট্রি, ডেফিনিট্নেস প্রভৃতি নানা কথায় তাঁরা প্রকৃতিকে নকল করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁরা যে আসলে বাস্তবকে অতিরঞ্জিত অতি-সুন্দর করে দেখাতেন তা তো প্রমাণ হয়ে গেছে।

দার্শনিক পেনসিলের ডগা সজোরে কামড়ে ধরে বললেন—প্লেটো কিন্তু তাঁর শেষ লেখা 'ফিলিবুস'-এ ঐ সৌন্দর্যতত্ত্বের হাঁড়ি ফাটিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বসূরীদের মাইমেসিস-তত্ত্বকে প্লেটো চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ঐ

মাইমেসিস-তত্ত্বই তো হচ্ছে বাস্তবানুকরণের ভিত্তি। এমন কি সরল রেখা বা আয়ত ক্ষেত্র, বা বক্র রেখা বা বৃত্ত—এগুলোকেও তিনি পারফেক্ট বিউটি আখ্যা দিয়েছেন। প্লেটো-প্রদর্শিত পথই তো অবলম্বন করেছেন আধুনিক ইওরোপের শিল্পীরা। কিউবিস্টরা তো স্পষ্টই ফিলিবুসকে তাঁদের বাইবেল বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেজান বলছেন, প্রকৃতির সব সৌন্দর্যের মূলে হল সিলিণ্ডার, স্ফিয়ার এবং কোণ। অটোমেটিজ্‌ম্‌ বা এব্‌স্ট্রাক্ট আর্টের মূলও তাই। ফিলিবুসকে ভিত্তি পেয়েছিলেন বলেই 'পল ক্লী একটি রেখার মধ্যে আবেগ দেখতে পান শত শত বৎসর ধরে ইওরোপীয় চিত্রকররা তথাকথিত বাস্তববাদের কব্জা ভেঙে নূতন বাস্তবোত্তর আর্ট সৃষ্টি করছেন।

ভাষাবিদ বললেন—ঠিক তেমনি ঠুনকো ন্যাকা-ন্যাকা সুন্দরপনা ঘুচিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভয়াবহকে অসুন্দরকে অবচেতনের দুঃস্বপ্নদের ছবিতে স্থান দিলেন। তেমনি যামিনী রায় জীবনানুকরণের পাট চুকিয়ে কণ্টুর আর জ্যামিতির রেখায় বাস্তবোত্তরকে ধরেছেন। যে দিকে তাকাবেন দেখবেন ফটোগ্রাফির বাস্তববাদ পরিত্যাগ করে বাস্তবোত্তরকে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। একমাত্র নাট্যশালাই অন্ধের মতন জীবনকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে চলেছে।

নাট্যকার বললেন—সংগীত দেখুন। সংগীতে কেউ বাস্তববাদের ছোঁয়া আশা করে? আগেই একদিন আলোচনা করেছি আমরা। আমাদের রাগসংগীতের কাঁধে, বাস্তবের জোয়াল চাপানো সম্ভব হয়নি। তেমনি সম্ভব হয় নি পাশ্চাত্ত্য সংগীতের কাঁধে। এমনকি, ওদের অপেরা দেখুন। পুরো কাহিনি আর আঙ্গিকটা রঙচঙে অতিরঞ্জনাশ্রিত। ভের্দির 'রিগোলেত্তো' অপেরার গল্প জানেন? জানেন 'টস্কা'-র গল্প? 'লা-বোহেম' বা 'ফাউস্ট' বা 'মাদাম বাটারফ্লাই'। উপকথার বিশালত্ব প্রতিটি গল্পে। কোথায় বাস্তবতা?

দার্শনিক পেনসিলটাকে চর্বিত অবস্থায় পরিত্যাগ করে বলে চললেন—নৃত্যের গোড়ার কথাটা কি? গল্পও আছে, চরিত্রও আছে,

জীবনভিত্তিক বটেই। তবু অসংখ্য মুদ্রা আর ভাব আর দেহ-সঞ্চালনের কায়দায় জীবনকে অতিক্রম করে রূপকথার রাজ্যে পৌঁছে যায় নাচ, তা ব্যালেই বলুন আর ভরতনাট্যমই বলুন! কই উদয়-শংকরকে বা উলিয়ানোভাকে তো কোনো দিন দেখলাম না নৃত্যছন্দ বিসর্জন দিয়ে জীবনানুকরণ করতে! তেমনি দেখুন, কবিতার প্রধান কৌশলটা কি? কথাগুলো সব জীবন থেকে আহরিত; তাদের আভিধানিক অর্থ আছে। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ হয়ে তাদের আরেক অর্থ এসে পড়ে, ধ্বনিগত একটা অর্থ, যাকে কোনো অভিধানে বাঁধা যাবে না। কাব্য একান্তভাবেই বাস্তবোত্তর। বাস্তববাদী কবিতা আর সোনার পাথুরে বাটি একই জিনিস।

অভিনেতা মৃদু ঢেঁকুর তুলে জিগ্যেস করলেন—কিন্তু উপন্যাস? সেখানে তো ছন্দ নেই। প্রতিটি কথা অভিধান-ব্যাকরণের অর্থে ভারাক্রান্ত। কথার অর্থকে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। তাই উপন্যাসকে বাস্তবোত্তরের পথে মুক্তি দেয়া অসম্ভব।

দার্শনিক বললেন—অসম্ভব বলবেন না; জেম্‌স্‌ জয়েস তাহলে এদ্দিন ধরে কি করলেন? গদ্যকেও এক নূতন চেহারা দিয়ে তার আক্ষরিক অর্থ ছাড়া আরো কিছু এনে ফেলার চেষ্টা করে জয়েস কৃতকার্য হয়েছেন। দেখুন, প্রতিটি কথার অর্থ থাকতে পারে; কিন্তু কথাসমষ্টি যে বাক্য সে বাক্যের লজিকটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারি। ধরুন,

আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ।

প্রতিটি কথার অর্থ সুবিদিত। অথচ সব মিলে যা হল তার অর্থ এ জগতে পাবেন না; এক *সুন্দরতর* জগতের দিকে আপনাকে হেঁচকা টান দিয়েছে লাইনটা। অথবা,

I thought I saw an elephant
Practising on the fife.
I looked again and found it was
A letter from my wife.

লুাইস ক্যারোল বা সুকুমার রায় অবলীলাক্রমে লজিকের গণ্ডি ভেঙে ভাষার বাস্তবোত্তরতা দেখিয়ে গেছেন। আবার দেখুন,

"দিনরাত তোমার ঐ হিদ হিদকারে আমার পাঁজজুরিতে তিড়িতংক লাগে।"

রবীন্দ্রনাথ বলছেন এ বাক্যটি বোঝবার জন্যে কোন অভিধানের দরকার হয় না। রবীন্দ্রনাথের মাথায় খেলেছিল এক নূতন ভাষার সম্ভাবনা—যেখানে অর্থের শৃংখল ছিন্ন হয়ে যাবে। ধ্বনির দ্বারাই সুরের দ্বারাই সে ভাষা নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারবে। সুকুমার রায়-লুাইস ক্যারোলের মতই রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শিশুদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন 'ছড়ার ছবি।' ভূমিকায় লিখলেন—

ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না; খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।'

জানি না বুইটেণ্ডিক-এর 'পেইন্' গ্রন্থে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য আছে কি-না; তিনি বলছেন মানুষ যন্ত্রণার মুহূর্তেই সত্যিকারের আত্মোপলব্ধি করে। তাই যদি হয় তবে 'রোগশয্যায়' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে বলছেন—

"অসুস্থ শরীরখানা
কোন অবরুদ্ধ ভাষা করিছে বহন,
বাণীর ক্ষীণতা
মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কারা—"

তার অর্থ কি? রোগ-জর্জরিত দেহে কি রবীন্দ্রনাথ সেই 'ছড়ার ছবি' বা 'গল্পসল্পে'র অর্থমুক্ত পাগল-ভাষার সম্ভাবনার কথা ভাবছিলেন? বাণীর ক্ষীণতা কেন? পার্থিব অভিধানে আবদ্ধ ভাষায় অপার্থিব বিশাল আবেগকে ধরতে পারছেন না, তাই কি এই ক্ষোভ? তাই কি আবার বলছেন—

"কবির ছন্দের খেলা সেও থাকি থাকি
নিশ্চিহ্ন কালের গায়ে ছবি আঁকা-আঁকি।"

সেই জন্যেই কি আরো স্পষ্ট ভাষায় বলছেন,

"মনে হয়, বৃথা বাক্য বলি,
সব কথা বলা হয় নাই;

আকাশবাণীর সাথে প্রাণের বাণার
সুর বাঁধা হয় নাই পূর্ণ সুরে,
ভাষা পাই নাই।"

আরো শুনুন—

"বিরাট মানবচিত্তে
অকথিত বাণীপুঞ্জ ?
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
মহাশূন্যে নীহারিকাসম।"

লক্ষ্য করুন—ভাষা পাই নাই, অকথিত বাণীপুঞ্জ। এই অকথিতকে প্রকাশ করার কি উপায় ? অর্থের শৃঙ্খল মোচন করে কথাকে উদ্দাম অর্থহীন আবেগে ছুটিয়ে দেয়া অসম্ভবের পথে। শুনুন, রবীন্দ্রনাথ বলছেন "আরোগ্য" গ্রন্থে :

"মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণদুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী……
লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন,
নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবন্ধ ভাষণ,
ছিন্ন করি অর্থের শৃঙ্খলপাশ।"

[illegible]র শেষ রেশকে মুছে ফেলার এ আহ্বান! এখানে রবীন্দ্রনাথ জয়েস-সুকুমার-ক্যারোলের রাজ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে উন্মুখ। তাইতেই তো কবির সুললিত ভাষা ছেড়ে চড়ুই পাখীর অর্থহীন প্রলাপের দিকে আকৃষ্ট হন রবীন্দ্রনাথ ; বলেন ভোরের চড়ুই পাখীর উদ্দেশ্যে—

"কালিদাসের ঘরের মধ্যে ঢুকে
ছন্দভাঙা চেঁচামেচি
বাধাও কী কৌতুকে॥"

এবং সেই পাখীর কাছে কবির একটিই প্রার্থনা—

"সহজ প্রাণের বাণী
দাও আমারে আনি ॥"

দৈনন্দিনের অবিরাম কর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত অতি-পরিচিত যে ভাষা তাকেও বাস্তব থেকে মুক্তি দিতে এঁদের সাধনা ; তাইতেই শুনি—

'Under the bam –
Under the boo -
Under the bamboo tree."

তাইতেই পড়ি—

"Spring
Too long
Gongula."

অথচ কি বিচিত্র এই নাট্যশালার পুরোধারা ! বাস্তবের আরাধনায় মগ্ন এঁরা। এঁদের কাছে তাই কাব্যনাট্য অপাংক্তেয় ; কারণ জীবনে মানুষ তো কাব্যি করে কথা কয় না। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকই তাহলে অবাস্তব ! অবাস্তব এলিয়টের 'মার্ডার ইন দা ক্যাথিড্রাল' ! শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকই বা থাকে কোথায় ? মানুষ জীবনে যা করে বা বলে তা অত্যন্ত সীমিত, বেশির ভাগটাই সে ভাবে। জীবনানুকরণ মানে কি শুধু তার বলার আয়তনটুকু ? না-বলার বৃহৎ জগৎটা তবে রইবে পড়ে ? এইজন্যেই কি আধুনিক নাটকে স্বগতোক্তি নিষিদ্ধ ? এই জন্যেই কি 'ছেলে খায় নি' আর 'মাইনে বাড়লো না' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ব্যবহারবাদে আমাদের নাটক আজ আচ্ছন্ন ?

নাট্যকার সরোষে বললেন—আর বলবেন না, দাদা ! পেটে টিউমার হয়েছে কি হয় নি, কিন্তু খেয়ে খাদে গেল না না-খেয়ে গেল, এইসব অবাস্তর খাটো কথায় নিজেকে আটকে রাখতে হয় ! এই পরিচালকরা মুখে ক্ষীরোদবাবুর, গিরিশবাবুর নাম করবেন ; অথচ কার্যক্ষেত্রে ক্ষীরোদ-আদর্শে গঠিত নাটক মঞ্চস্থ করবেন না। লোকে এখন যা চায় তাই দিয়ে যাবেনই এঁরা !

এবার পরিচালক কথা কইলেন, যেন হাঁড়ির মধ্যে থেকে--হাঁা, ঠিক তাই। নাট্যশালা প্রত্যক্ষ দর্শক-সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। আপনারা যা বললেন প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আমার দর্শক কি একমত? এগিয়ে চলা যাক। ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন আমার দর্শকও বাস্তবোত্তরকে চাইবে। সেই দিনই আমি বাস্তবোত্তরের দিকে পা বাড়াবো। তার এক মুহূর্ত আগে নয়।

পরিশিষ্ট ঃ থিয়েটারের ভাষা

থিয়েটারের কোনো নিজস্ব ভাষা আছে কি? লেখকেরা, কবিরা কথা সাজান। চিত্রকর সাজান রং। গায়ক গাঁথেন স্বরের মালা। প্রত্যেকেরই নিজস্ব মাধ্যমের অটুট রীতিনীতি আছে, ব্যাকরণ আছে, ব্যঞ্জনা-অলংকার আছে। কবি বলেন—

আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয়-তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতায়
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা
তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।

আমাদের মন চলে যায় নিভৃতের দিকে, আবেগ আসে কথার জোয়ারে। কিন্তু এটা তো আকস্মিক নয়। রীতিবাগিশ অধ্যাপক তীক্ষ্ণ কলমে ব্যবচ্ছেদ করেও দেখবেন ছত্রে ছত্রে রয়েছে উপমা, কালিদাসীয় ব্যঞ্জনার অঙ্ক-কষা প্রয়োগ। ব্যঞ্জনার মাধ্যমে বাচ্য। ব্যঞ্জনায় বাচ্যে রাজযোটক: বিশ্বকবির হাতে কাব্যরীতির ব্যবহার!

অবনীন্দ্রনাথ আঁকলেন পূর্ববঙ্গের ল্যাণ্ডস্কেপ। দেখে মন নিরুদ্দেশে উধাও হতে চায়। সেটাও শিল্পী দৈবভরসায় ছেড়ে দেন নি। সমালোচকের বেরসিক চোখও ধরতে পারবে না কোনো ভুল—না ড্রয়িং-এ, না বর্ণালি-বিভঙ্গে। প্যাস্টেল আর ক্রেয়নের পশ্চিমী কায়দাকানুন সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়েছে, রয়েছে কমনীয়তা, প্যাটিনার ধাঁচ, রয়েছে ভেনিশীয় বর্ণচ্ছটা ধূসর ছবিতে লাল ঘুড়ি—পশ্চিমী বৈচিত্র্যনীতি অনুসৃত হয়েছে দৃঢ়ভাবে। আঙ্গিকের আইন মেনেছেন অবনীন্দ্রনাথ; সে আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই ফুটিয়েছেন সীমানাহীনের চেহারা। আইনটাই তাঁর হাতে অস্ত্র।

ওস্তাদ কেদারা গাইছেন। তানের পর তানে চমৎকৃত হয়ে উঠছি

আমরা)। কতরকমের গমক হলক। কি বিচিত্র মুখে আসার ভঙ্গিটা। কি অবশ্যম্ভাবী সম্-এ এসে দাঁড়ানো। সেই সুরের মায়াজালে চোখের সামনে যেন দেখতে পাই এক যুবতীকে, আলুলায়িত কেশদাম, পরিধানে গৈরিক বসন। তাঁকে ঘিরে নাচছেন সখীরা। মহাদেবের আরাধনায় মগ্না যুবতীও নৃত্যরতা। স্পষ্ট শুনছি শঙ্খধ্বনি আর সখীদের পায়ে নূপুরের রিনিঝিনি। ফৈয়াজ খাঁ থামলেন। চমক ভাঙল। মনে হল সমস্ত আইনকানুনের ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন খাঁ সাহেব। কিন্তু সত্যি কি তাই? কোথাও কি কেদারার বিশেষ রূপ লঙ্ঘিত হয়েছে? বাদী মধ্যম না ছুঁয়ে তান দিয়েছেন? সংবাদী ষড়জকে অবহেলা করেছেন? বক্র গান্ধার না লাগিয়ে মধ্যমে গেছেন? মার্গসংগীতের হাজারটা খুঁটিনাটি সব সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। কেদারা খেয়ালে এসেছে পর পর বেহাগ, শংকরা, হাম্বীর, বাগেশ্রী, নট কামোদের ছায়া। রয়েছে ঝাঁপতাল, ত্রিতালের কঠোর ছন্দ। রয়েছে আলাপ, বাহে আলাপ, অস্থায়ী অন্তরা, মুখ-এর জটিল আঙ্গিক। এসবকে স্বীকার করেই ফৈয়াজ খাঁ-র সুরসৃষ্টি। আইন মেনেই বে-আইনের ভান। চরম নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেই বেপরোয়া, উদ্দাম অনিয়ম।

কিন্তু থিয়েটারের নিয়ম কোথায়? কোথায় তার ব্যাকরণ, তার অভিধান?

থিয়েটারে আছেন অভিনেতা। তিনি কথা বলেন, চলাফেরা করেন, হাত-পা নাড়েন। তবে কি তিনিই মূল গায়েন? তাঁর বাচিক অভিনয়ই যদি থিয়েটারের প্রধান উপকরণ হয়, তবে থিয়েটার আর আবৃত্তির পার্থক্য থাকে কি? যদি অভিনেতার অঙ্গসঞ্চালনই মূল হয়, তবে নৃত্যবিদ হেসে বলবেন—আমার শিল্পেরই বটতলা সংস্করণ হল থিয়েটার।

তারপর আছে দৃশ্যসজ্জা। এখানে আবার থিয়েটারের সঙ্গে চিত্রকলার নাড়ির যোগ অনুভূত হয়। সেই সঙ্গে স্থাপত্য-ভাস্কর্যেরও।

তারপর বোধহয় আলোকসম্পাত। এখানে আবার ভোল্টেজ অ্যাম্পিয়ার-সার্কিট ডিমার-স্টেপলেন্স আশ্রয় করে এসে পড়েছে নিছক

বিজ্ঞান। প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি রং-এর খেলায় রয়েছে আবার ঐ চিত্রকলার আমেজ। ঘনত্ব দূরত্ব প্রভৃতি সৃষ্টির মধ্যেও তাই।

তারপর সংগীত। থিয়েটারের সংগীত স্বাধীন নয়, এখানে তার মুক্ত উচ্ছ্বাসের স্থান নেই। নাটকের প্রয়োজনে সে সীমিত, অবরুদ্ধ। তথাপি সে সংগীত। অতএব আর-একটি ললিতকলার আমদানি।

থিয়েটার তাই বারোয়ারি। থিয়েটার নানা শিল্পের সমন্বয়—কথাটা শুনতে বেশ। তেল আর জলেরও সমন্বয় ঘটাবার বৃথা চেষ্টা অনেকে করেছেন। সমন্বয়, না সংঘর্ষ সেটা বিচারসাপেক্ষ।

সমন্বয় কি সম্ভব? এই মূল প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলে ঐ সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মতনই একটা না-ধর্ম না-সমন্বয় সৃষ্টি হবে।

কথা আর অঙ্গসঞ্চালনের সমন্বয় কি সম্ভব? দৃশ্যমান মঞ্চসজ্জা ও শ্রুত-সংগীতের সমন্বয় কি সম্ভব? অভিনেতার কণ্ঠস্বর ও রঙীন আলোর যাদু—একটা শুনছি, আর-একটা দেখছি। এ দুয়ের সমন্বয় কি সম্ভব? এর জবাব যদি কেউ না দিতে পারেন তবে পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হবে থিয়েটারের নিজস্ব কোন ভাষা নেই। সে এতগুলি শিল্পমাধ্যমকে গ্রহণ করেছে, মেলাতে পারে নি; চুরি করেছে, নিজের করে নিতে পারে নি; গিলেছে, হজম করতে পারে নি।

মূল তত্ত্বগত প্রশ্ন একটিই: যা শুনেছি আর যা দেখছি—এ দুয়ের মিলন কি সম্ভব? এমন একটা ক্ষেত্র কি নেই যেখানে দৃশ্য ও সংগীত, নৃত্য ও কথা জাত না খুইয়ে একাসনে বসতে পারে?

সংগীত নিয়েই আগে আলোচনা করা যেতে পারে। লাল গানে নীল সুর সম্ভব হলেই কার্যোদ্ধার হয়। গানের রঙ আছে কি?

দামোদর মালকোষের রূপ বর্ণনা করেছেন—

আরক্তবর্ণো ধৃতরক্তযষ্টিঃ বীরঃ সুবীরেষু কৃতপ্রবীর্যঃ।

মালকোষের রঙ লাল, হাতে রয়েছে রক্তবর্ণ যষ্টি। মালকোষের স্বরসমষ্টি থেকে একটা স্পষ্ট রঙ-এর ঝিলিক খেলছে দামোদরের চোখে। রাগের ধ্যানরূপটা কবিকল্পনা বলে ওড়াতে পারেন, রঙটা পারেন না।

তেমনি—মধুমধ সারং কনকবর্ণা পীতবসনা। ভৈরবীও পীতবসনা। পণ্ডিত সোমনাথের চোখে বরাটি নীলাম্বরা। টোড়ি তুষারের মত শুভ্র। বসন্ত নীলবর্ণ। বিলাবল শ্যামা। রামকেলি সোনালি। প্রায় প্রত্যেক রাগে প্রাচীন সংগীতরসিকরা আবিষ্কার করেছিলেন রঙ।

য়ুরোপের পের কাস্তেল্ যে অকিউলার মিউজিকের তত্ত্ব দিয়েছিলেন তাও এই শব্দবর্ণ-সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেঠোফেনের পঞ্চম সিম্ফনির প্রথম আলেগ্রো অংশ যে কালো আর নীল-এর সংমিশ্রণ, তাতে অনেক পণ্ডিতেরই আর কোনো সংশয় নেই। চাইকভ্স্কির লিটল রাশিয়ান সিম্ফনি প্রধানত হল্দের উপর আঁকা। বেঠোফেনের কোরাল সিম্ফনি উজ্জ্বল বেগুনি আর লালের আলোড়ন।

রেনে গীলেরে আধুনিক Jazz সংগীত সম্বন্ধে বললেন—'It n'y a plus de perspective'—এ সংগীতে পার্স্পেকটিভ নেই, দূরে-কাছে পারস্পরিক অনুপাত নেই। আধুনিক চিত্রকলায় বেন নিকল্সন অথবা জঁ। নাজেন-এর কাজের সঙ্গেই যেন তুলনা চলে Jazz-এর। এঁরা ছবি আঁকেন জ্যামিতিকে কেন্দ্র করে। সোজা সোজা রেখা টেনে গড়ে তোলেন অনেকগুলি এলোমেলো চতুর্ভুজ, ত্রিকোণ। উজ্জ্বল রঙ-এ ভরিয়ে দেন সেগুলো। মনে হয় আধুনিক সভ্যতার আধুনিক মানুষের ছন্নছাড়া জটিল মনস্তত্ত্ব এক লহমায় রূপ নিল সামনে। দূরে-কাছের কোন তারতম্য নেই; রাত্রে নিওন-উদ্ভাসিত চৌরঙ্গীর মতন দূরত্ব বা নিকটত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে; সবটা যেন একসঙ্গে খাড়া হয়ে এসে গেছে কাছে। Jazz সংগীতের চমক-লাগানো চীৎকারেও একই রূপরীতি আবিষ্কার করেছেন গীলেরে। মন্দ্র-সপ্তক আর তার-সপ্তকের সব পার্থক্য ঘুচিয়ে, কাউন্টার-পয়েন্টের নিয়মাবলী ভেঙে উড়িয়ে, যে-কোন স্কেলে যে-কোন স্বর ব্যবহার ক'রে এক হৈ হৈ কাণ্ড সৃষ্টি করা হচ্ছে। নিকলসনের স্টিল লাইফের মতই কোথাও বাঁশীর ফিকে সবুজ আর্তনাদ, কোথাও চেলোর কাল কাল ঝংকার, কোথাও ট্রাম্পেটের ক্যাটকেটে হল্দে চীৎকার।

সংগীত বাদ দিন—সামান্য স্বরবর্ণগুলির মধ্যেই র‍্যাবো খুঁজে পেয়েছেন

এক একটা রঙ। তাকে অনুসরণ করে আমাদের কবিরাও ভেবে দেখবেন অ-বলতে একটা নিটোল সাদা পাওয়া যায় কি-না। আ-বলতে এসে গেল একটু হলদে, একটু দুপুর রোদের ভাব। ই-র মধ্যে যেন গাঢ় রঙ-এর আভাস পাচ্ছি; সবুজ নাকি? উ-আরো গাঢ়, প্রায় কাল।

রঙীন সুর তো পাওয়া গেল। এবার সুরেলা রঙ পেলেই হয়।

রাজপুত রাগমালার ছবি বিচার করুন। ষোল শতক থেকে হিন্দীতে রাগমালা কাব্য লেখা চলন হল। আর এইসব পুঁথিতে রাগরাগিণীর ছবি এঁকে দেখান হল। ছবিগুলো যে সব সময়ে ভরতশাস্ত্রগত রূপ রক্ষা করল তা নয়। উপরন্তু রাজপুতশিল্পী মনের আনন্দেই যেন এঁকে গেছেন ছবি। অথচ সে ছবির রেখায় রঙে, কোথায় যেন ধ্বনিত হচ্ছে সংগীত। গম্ভীর শিবমূর্তি ভৈরব রাগের চেহারা। শিবপূজায় মগ্না বধূ ভৈরবী। ব্রহ্মাপূজা খম্বাবতী। ঝুলনের দৃশ্য হিন্দোল। এক নারী বীণা বাজাচ্ছেন, মুগ্ধ হরিণ এসেছে কাছে—টোড়ি। মল্লযুদ্ধ—দেশাখ্য। হোলি আর নাচের উন্মাদনায় আনন্দ—বসন্ত। বর্ষায় কৃষ্ণের লীলা—মেঘ। এক নারী ময়ূরকে সংগীত শোনাচ্ছেন—গুর্জরী। নায়ক পুষ্পধনু থেকে তীর ছুড়ছেন—বিভাস। শিল্পীর রঙ-রেখায় ফুটে উঠেছে এক-একটি রাগের আমেজ।

হুইস্‌লার ছবির নাম দিলেন 'হার্মোনি ইন গ্রীন'। ছবির কোনো প্রচলিত ধাঁচের বিষয়বস্তু নেই. নামেই বোঝা যাচ্ছে হুইস্‌লার সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—বলেছেন তাঁর ছবি আসলে সংগীত, সবুজ সংগীত। এমনি আরো নাম দিয়েছেন—'নকতুর্ণ ইন ব্লু অ্যাণ্ড সিল্‌ভার, (এবং সত্যি, ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকালে শোপাঁর মধুর রাত্রি-সংগীত মনে পড়বে) 'নকতুর্ণ ইন ব্লু এণ্ড গোল্ড' 'সিম্ফনি ইন হোয়াইট' (শেষোক্তটি কেন জানি না ব্রাম্‌স্‌-এর দ্বিতীয় সিম্ফনি স্মরণ করিয়ে দেয়)।

গোগাঁ নিজের একটি ছবি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:
"The musical element. harmonies of orange and blue woven

together by yellows and violets, all lighted by greenish sparks.

তত্ত্বগত ক্ষেত্র তাহলে প্রস্তুত আছে ; রঙ আর সুরের মাঝে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর কিছু নেই। এমনভাবে অভিনেতাদের নড়াচড়া সম্ভব যা হয়ে উঠবে কথারই চিত্ররূপ ; এমনভাবে দৃশ্যসজ্জা ও আলো সাজানো সম্ভব যা কথা আর সংগীতকেই প্রতিফলিত করবে চোখের উপর। আবার কথা আর সংগীতকেও এমনভাবে সাজানো যায় যা ধ্বনিত করবে দৃশ্যপটের সুরটাকে। এ মিলন যদি সম্ভব হয়, তাহলে থিয়েটারের নিজস্ব ভাষাসৃষ্টিও সম্ভব। নচেৎ কথা, আঙ্গিক-অভিনয়-দৃশ্য-সংগীতে গৃহযুদ্ধ। নচেৎ হয় কথা, নয় আঙ্গিক অভিনয়, নয় দৃশ্য, নয় সংগীতের আধিপত্য, অন্য সকলের আত্মসমর্পণ এবং অন্যের ধার-করা ভাষা নিয়ে থিয়েটারের চর্বিতচর্বণ।

থিওরি না হয় পাকা হল, তবু মিলন হয় না কেন? পৃথিবীর অধিকাংশ থিয়েটারেই হয় নি এখনো। বাধা কি?

বাধা সাহসের অভাব। সর্বশিল্প-সমন্বয় প্রভৃতি ধোঁয়াটে কতকগুলি আপ্তবাক্য অনেকেই আওড়ান। কিন্তু তার যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সে দিকে এগুনোর সাহস নেই। মূলে যাওয়ার সদিচ্ছাই যেন কারুর নেই।

এরই বা কারণ কি? কয়েকটা মামুলি কারণ আছে যা সহজেই অপনেয়। যথা, অভিনেতা নামক বিচিত্র জীবটি। এলিনোরা ডুজের মতন অভিনেত্রী খেদোক্তি করেছিলেন---থিয়েটারকে বাঁচাতে হলে সব অভিনেতা-অভিনেত্রীকে আগে এক মড়কে সাবাড় হতে হবে। বহু বৎসরের প্রাচীন নজীর ঘাড়ে চেপে আছে---অভিনেতাই নাকি থিয়েটারের প্রধান ও একমাত্র হীরো। তাঁকে আলোকে ফোকাসে উদ্ভাসিত করাই আলোর কাজ। তাঁকে উজিয়ে দিতেই দৃশ্যসজ্জা। তাঁকে কেলাপ পাওয়াতেই নাট্যকারের কথা-সাজানো। তাঁর প্রচণ্ড আবেগকে রূপ দিতে মাঝে মাঝে ঝাঁজ আর বেহালার শব্দ করাই সঙ্গীতকারের কাজ। প্রাচীন নাট্যশালার ইতিহাস ঘেঁটে এঁদের বোঝানোও শক্ত যে অভিনেতা মূল গায়েন

হয়েছেন বেশীদিন নয়—আঠারো শতকের য়ুরোপে মাত্র—কারণ যে পাগল হয়েছে সে নিজেকেও খেপিয়েছে, অন্যকেও খেপিয়ে মারছে। দম্ভের মতন সংক্রামক ব্যাধি বিরল। একজন অর্ধশিক্ষিত স্ফীতমস্তিষ্ক অভিনেতা একটা পুরোদলের সর্বনাশ ঘটাতে সক্ষম। সেইরকমই দেখা দেয় আলোকশিল্পের মধ্যে, দৃশ্যসজ্জাকরের মধ্যে, সংগীতকারের মধ্যে। কেউই সামগ্রিক প্রযোজনার সামনে সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। কিন্তু এগুলি সাধারণ মানবিক অসুস্থতা। একে দমন করা সম্ভব। দ্বিতীয় বাধাটি আরো ভীষণ। এটি হল তথাকথিত রিয়্যালিজম - বাস্তবতা। কি কুক্ষণে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হিল ফোটো তুলে বসলেন; তারপর থেকেই রিয়্যালিজম্-এর দাপটে থিয়েটার থেকে কাব্য ছন্দ সুর রঙ বিতাড়িত হয়েছে কেন না সবটাই নাকি হবে বাস্তব, বাস্তবানুগ। বাস্তবে যা ঘটে তারই অনুকরণ। তাকে কি আর্ট বলে? পুরো থিয়েটারটাই তো মেকি। সামনে ঝুলছে যবনিকা। মাঝে মাঝে আবার তা সবেগে পতিত হয়ে বাস্তবচিত্রটাকে খান খান করে দিচ্ছে। অমন চটকদার বাস্তব ড্রয়িংরুমের দু পাশেই রয়েছে কাল কাল অবাস্তব উইংস। ওপরে ঝুলছে সম্পূর্ণ অবাস্তব ঝালরের সারি। চট আর কাঠের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অভিনেতাকে মনে করতে হবে এটা আসল ইটের ইমারত! এটা কি বাস্তবতা, না বাস্তবতার ভান? আর ভান কি ক'রে আর্টের পর্যায়ে উঠবে বলুন।

মেকি ড্রয়িংরুমে লজ্জা-লজ্জা ভাব করে তাকে খাঁটি বলে চালানোর চেষ্টা বাতুলতা। পুরো আধুনিক থিয়েটারই (কয়েকটি পাশ্চাত্য পরীক্ষাধর্মী মঞ্চ ছাড়া) আজ এই চরম লজ্জায় ভুগছে। ঢেকে রাখার চেষ্টা। পাছে কোথাও কৃত্রিমতা বেরিয়ে পড়ে এই আতঙ্কে জড়সড়। থিয়েটারকে পাছে থিয়েটারি মনে হয় এই ভয়ে হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে আড়ষ্ট অভিনয়।

অথচ ঐ কৃত্রিমতাই হবে থিয়েটারের ভিত্তি। আগেই বলেছি, শব্দকে রঙ-এর পর্যায়ে তুলতে হবে, রঙকে শব্দের। সেখানে বাস্তবের চৌহদ্দিতে শব্দকে বা রঙকে বাঁধা কি সম্ভব?

কথা যদি কেবলমাত্র অর্থই বোঝায়, শুধু বাচ্যার্থে সীমিত থাকে, তবে কি তাতে রঙ-এর ঝিলিক আসতে পারে ? জীবনকে অনুকরণ করলে 'কেমন আছ ?' 'উঃ কি জ্বালা !' ধরনের কিছু কথা ছাড়া আর-কিছু বলা যায় কি ? প্লট আমদানি করেই নাটক জীবনোত্তর হয়ে গেছে কারণ জীবনে প্লট নেই, নায়ক নেই, ভিলেইন নেই। তাই ভাষাকেও জীবনোত্তর করে তুলতে আপত্তি কি ? তাকে ধ্বনিগত সৌন্দর্য দিতে বাধা কি ? সত্যিকারের যে যুবক আত্মহত্যা করতে যায়, সে হয়তো দিনের পর দিন মুখ ভার করে বেড়ায়, শুকিয়ে ওঠে, তারপর একদিন গলায় দড়ি দেয়, লিখে যায় আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ি নয়। এটুকু বলার পিছনে না বলার যে বিশাল জগৎটা রয়ে গেল সেটা কি থিয়েটারের উপজীব্য নয়, সেটা কি বাস্তবের অংশ নয় ? তাই 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল,' ধরনের কথা দিতে আপত্তি কি ? অথবা 'To be or not to be ?'

কথার মধ্যে রঙ আনতে গেলেই তাকে বাচিক অর্থ ছাড়াও আরো একটা কিছু বহন করে আনতে হবে। শব্দের মধ্যে তখনই বর্ণ আসে যখন সে শব্দ হয় ছন্দোবদ্ধ, যখন সে শব্দের থাকে সুর। যে সামান্য সুর নিত্যব্যবহার্য কথাবার্তায় থাকে, তা পর্যাপ্ত নয়। তাকে আশ্রয় করলে নাটক ঐ জীবনানুকরণেই আবদ্ধ থাকবে ; জীবনোত্তর শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠবে না।

আর এটাই আধুনিক নাটকের স্ব-বিরোধ। নাটক হবে জীবনানুগ, নাটক হবে শব্দবর্ণের সমন্বয়—এ দুটো প্রতিপাদ্য একই সঙ্গে বলা হচ্ছে। অথচ এরা পরস্পরবিরোধী।

তবে নাটক কোন্ পথ নেবে ? কে জানে। নানা মুনি নানা তপোবনে নানা তপস্যায় নিযুক্ত। প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষ্য ও টীকা। প্রত্যেকেরই একদল আবেগান্ধ শিষ্য।

কিন্তু গোড়ার কথাটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন কি ? থিয়েটার নানা শিল্পের মিলিত সৃষ্টি, আর এই মিলের ভিত্তি হল পরস্পরের

সঙ্গে ক্রমশ একাত্ম হওয়ার প্রচেষ্টা। শব্দকে হতে হবে বর্ণ, বর্ণকে হতে হবে শব্দ।

আর এ থিয়োরির শত্রু হলেন বাস্তববাদীরা, অর্থাৎ ফোটোগ্রাফ-পন্থীরা। এঁরা ভুলে যান শিল্প ঠিক জীবন নয়; শিল্প জীবনোর্ধ্ব, কালোর্ধ্ব, দেশোর্ধ্ব একটা কিছু। জীবন প্রবহমান; থিয়েটার স্থিতু। জীবন সম্পূর্ণ, নাটক খণ্ডিত। এই খণ্ডিতের মধ্যে সম্পূর্ণতার চেহারাটা ধরতে গেলেই খণ্ড চিত্রকে একটা বাস্তবোত্তর রূপ দিতে হবে। রঙ-এ ছন্দে বাঁধতে হবে তাকে। নইলে সে হয়ে থাকবে একটা বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের অসংলগ্ন চিত্র।

যামিনী রায়ের ছবি ফোটো নয়। ফোটো হলে সে আর্ট হত কি?

ডস পাসোস-এর, জয়েস-এর উপন্যাস ঠিক দৈনন্দিন ঘটনার দিনপঞ্জী নয়। কাম্যুর 'লেত্রঁজের' প্রবেশ ক'রে গেছে নায়কের চিন্তারাশির মধ্যে, ব্যবহারিক জীবনে আটকা থাকে নি।

পিকাসো বা মাতিস কি জীবনবিমুখ? না, জীবনের বৃহত্তর সত্যের অন্বেষণেই তারা ধাবিত।

পশ্চিমের এক মহৎ শিল্পসৃষ্টি হল অপেরা। অপেরায় সংলাপ নেই, আছে গান। রূপসজ্জা উজ্জ্বল, রঙীন- মানুষকে মনে হয় এক বৃহৎ ছবির অংশ। সেই ছবিরই আর-এক অংশ হল কাব্যকল্পনায় উদ্ভাসিত দৃশ্যসজ্জা। এ যেন রঙীন রূপকথার রাজ্যে কি রকম কাহিনী উপস্থিত হচ্ছে?

রিগোলেত্তো রাজসভার বিদূষক, কুঁজো, এনামেল করা মুখে আবেগ-হীন নিশ্চল মৃত হাসি। লম্পট ডিউকের সব পাপের সে সহচর। অবশেষে একদিন ডিউকের আদেশে সে যে মেয়েটিকে হরণ ক'রে আনে প্রাসাদে— একটু দেরী করে জানতে পারে সে তার নিজেরই কন্যা। ক্রোধোন্মত্ত রিগোলেত্তো ডিউককে হত্যা করতে সংকল্প করে। কিন্তু এমনই গ্রহের ফের—যে দেহটি বস্তায় বেঁধে সে বিজয়োল্লাসে যায় নদীতে নিক্ষেপ করতে, সে দেহটি তারই কন্যার। ভাড়াটে খুনী স্পারাফুচিলের চাতুর্যে

নিহত হয়েছে রিগোলেত্তোরই কন্যা, ডিউক নয়। রচয়িতা ভের্দি, ভিক্টর হুগোর 'লা রোয়া সামুজ' অনুসরণ করেছেন। কি নেই এতে? খুন, নারীহরণ, একাধিক প্রেমের উপন্যাস, নিয়তির অমোঘ হস্তক্ষেপ। তা বলে কি এ জীবনবিমুখ? নাকি অসংখ্য ঘটনা সংস্থাপিত করে রচয়িতা এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন—যে এতে জীবনকে অনুকরণ করার শিশুসুলভ প্রয়াস নেই, এ ইচ্ছে করেই উপকথার মতন ঘটনাড়ম্বরে সমৃদ্ধ। 'রিগোলেত্তো' যে কাহিনী এর জন্যে ভের্দি লজ্জা পান না: সদম্ভে তিনি বলেছেন—হ্যাঁ, এ কাহিনী। কাহিনী কাহিনীই হবে। কাহিনীকে মুখ লুকিয়ে সত্য ঘটনার ছদ্মবেশ পরতে হবে না।

'হ্যামলেটে' কি নেই? ভূত, ষড়যন্ত্র, বিষপ্রয়োগ, শোকজর্জরিত নায়কের প্রেম-প্রত্যাখ্যান, তলোয়ার খেলা। মায় গুটি ছয়েক পতন ও মৃত্যু। তাবলে কি জীবনের সর্ববৃহৎ সত্যের অতি কাছাকাছি পৌঁছতে অপারগ হয়েছেন শেক্স্পীয়ার? সেই রূপনীতিই অনুসৃত হয়েছে হুগোর 'এরনানি'তে, শিলের-এর 'ভিলহেল্ম্ টেল্'-এ, মলিয়েরের 'তার্তুফ'-এ।

অবশেষে এই জীবনোত্তর সত্যে পৌঁছবার চেষ্টা দেখা দিয়েছে আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে ব্রেশ্ট্, টলের, শেরউড অ্যাণ্ডারসন, ক্রিস্টোফার ফ্রাই, টি, এস, এলিয়টের মধ্যে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' বা 'নর-নারায়ণ' কি অবাস্তব? রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'-তে আধুনিক সমাজব্যবস্থার নগ্ন চেহারা কি তথাকথিত বাস্তববাদী নাটকের চেয়ে কম ফুটেছে?

আইজেনস্টাইনের ছবিও নাকি বস্তুকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে দেখায়। তা বলে 'ইভান' আর্ট নয়? চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন - কারণ থিয়েটারের তুলনায় সে শুধু বয়ঃকনিষ্ঠই নয়, সে অর্বাচীন। অথচ সে সৃষ্টি করে নিয়েছে তার নিজস্ব ব্যাকরণ, তার ব্যঞ্জনা ও অলংকার। এই দেখছি বহু দূরে দিকচক্রবালের কাছে একটা মানুষ, পরের ফ্রেমেই দেখছি পর্দা-জুড়ে সে মানুষটির ছবি, সে হাত তুলল ঘড়ি দেখতে—চট করে পুরো পর্দাটা অধিকার করল ঘড়িটা। কোত্থেকে কোথায় এলাম!

এটাই চলচ্চিত্রের নিজস্ব কায়দা—দর্শকচক্ষুকে যত্র তত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। সেটাই সে ব্যবহার করে নির্ভয়ে। বাস্তবতার খাতিরে নিজের বৈশিষ্ট্যকে সে চেপে রাখে না, কুণ্ঠাবোধ করে না।

এতেও হয়তো পারস্‌পেক্‌টিভ খান খান হয়ে ধ্বসে যায়। কিন্তু আর-একটা কিছু সঞ্চারিত হয় দর্শকমনে। চমক লাগে। বৃহত্তর কিছুর আস্বাদ দেয়।

বিশেষ করে আধুনিক জীবন এত বিচিত্র, এত সংঘাতপূর্ণ, এত বাঁকাচোরা টুক্‌রো টুক্‌রো রূপে, যে এর প্রতিফলনকেও তেমনি জটিল হতে হবে। অতিসরলীকরণে তৃপ্ত হয় শুধু নির্বোধরা।

তাই এক থিয়েটার ছাড়া আর সব শিল্পক্ষেত্রেই চলেছে এই নতুন তালগোলপাকানো জীবনকে ধরার প্রচেষ্টা।

আগে য়ুরোপের চিত্রকররা আঁকতেন যথাযথ প্রতিরূপ। পরে এলোমেলো করে দিলেন পারসপেক্‌টিভ। সমালোচনার ঝড় উঠল যা দেখেছি তা আঁকছে না কেন? এসব আবার কি উদ্ভট জ্যামিতিক খেয়াল? মাতিস জবাব দিয়েছিলেন—These apparent abstractions have only one end in view to express the sentiment that the artist has of life.

অত বলারও প্রয়োজন ছিল না। মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার থুলেস পরীক্ষা চালিয়ে দেখালেন মাতিসরা যা আঁকছেন সেটাই হচ্ছে বস্তুর আসল চেহারা, মানবচক্ষু সেটাই দেখে। প্রাচীনপন্থীরা তাকে পল্লবিত করে, সর্বাঙ্গসুন্দর করে দেখাতেন। অবাস্তব তাঁরাই, আধুনিকরা নন—'Some artists have departed very far from perspective drawing. I have found that certain of the post-impressionist painters drew inclined objects in ratios which were about those of the phenomenal shapes as measured in the experiments.

ফোটোগ্রাফ বাস্তব নয়, মাতিসের ছবিই আসল বাস্তব, বাস্তবপন্থীরা এবার কি বলবেন?